৭. **নির্দেশ অনুযায়ী বাক্য পরিবর্তন করো :**

৭.১ আমার পক্ষে এর উত্তর দেওয়া সুকঠিন। (না-সূচক বাক্যে)

৭.২ সেই জন্যই সাধারণের কাছে মুখ দেখাতে সে লজ্জা পায় (প্রশ্নবোধক বাক্যে)।

৭.৩ লজ্জায় তারা বাড়িতে কোন সংবাদ দেয়নি। (যৌগিক বাক্যে)

৭.৪ কতকগুলি অভাব আছে যা মানুষ ভিতর থেকে পূর্ণ করে তুলতে পারে। (সরল বাক্যে)

৭.৫ বিনা দুঃখ কষ্টে যা লাভ করা যায় তার কোন মূল্য আছে? (নির্দেশক বাক্যে)

৮. **নীচের প্রশ্নগুলির উত্তর নিজের ভাষায় লেখো :**

৮.১ 'শুধু শাস্তি দেওয়া নয়, সংশোধনই হওয়া উচিত জেলের প্রকৃত উদ্দেশ্য।' — তুমি কি এই বক্তব্যের সঙ্গে একমত? তোমার উত্তরের পক্ষে যুক্তি দাও।

৮.২ 'আমাদের দেশের আর্টিস্ট বা সাহিত্যিকগণের যদি কিছু কিছু কারাজীবনের অভিজ্ঞতা থাকত তাহলে আমাদের শিল্প ও সাহিত্য অনেকাংশে সমৃদ্ধ হতো।' — এ প্রসঙ্গে কারাজীবন যাপনকরা কয়েকজন সাহিত্যিকের নাম এবং তাঁদের রচিত গ্রন্থের নাম উল্লেখ করো।

৮.৩ পত্রটি পড়ে কারাজীবন বিষয়ে তোমার যে ধারণা ও অনুভূতি জন্মেছে — তা জানিয়ে বন্ধুকে একটি পত্র লেখো।

৮.৪ নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুর সম্পর্কে আরো জেনে 'সুভাষচন্দ্রের স্বদেশপ্রেম' বিষয়ে একটি প্রবন্ধ রচনা করো।

স্বাধীনতা

ল্যাংস্টন হিউজ

স্বাধীনতা কোনোদিনই আসবে না,
না,
আজ নয়
কোনোদিনই নয়
ভয় অথবা সমঝোতার মধ্যে,
তার কারণ
আমাদেরও তো অন্য সকলের মতন
অধিকার রয়েছে ,
দুপায়ের ওপর দাঁড়িয়ে থাকার,
দুকাঠা জমির মালিকানার,

শুনে শুনে কান পচে গেল,
'সময়ে
সবই হবে, কাল একটা নূতন দিন'—

মৃত্যুর পরে তো আমার কোনো
স্বাধীনতার প্রয়োজন হবে না,
আগামীকালের রুটি
দিয়ে কি আজ বাঁচা যায়,
স্বাধীনতা একটা শক্তিশালী বীজপ্রবাহ,
বাঁচার জন্য,
একটা বড়ো প্রয়োজনের জন্য,
আমিও তো সেখানেই বাস করি,
তুমি যেখানে,

তাই
স্বাধীনতা আমার প্রয়োজন
তোমার যেমন।

তরজমা : শক্তি চট্টোপাধ্যায় ও মুকুল গুহ

হাতে কলমে

ল্যাংস্টন হিউজ (১৯০২—১৯৬৭) : বিংশ শতকের কুড়ির দশকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের হার্লেম রেনেসাঁসের অন্যতম নেতা হিসেবে সমধিক পরিচিত। তিনি একাধারে কবি, ঔপন্যাসিক, নাট্যকার এবং সমাজকর্মী ছিলেন। তাঁর প্রথম কাব্যগ্রন্থের নাম *The Weavy Blues*। তাঁর রচিত অন্যান্য বই *Male Bone, Jerico-Jim Crow* প্রভৃতি। কাব্য স্রষ্টা হিসেবে তিনি বহু পুরস্কারে সম্মানিত হয়েছিলেন।

১.১ ল্যাংস্টন হিউজের প্রথম কাব্যগ্রন্থের নাম কী?

১.২ তিনি কোন দেশের রেনেসাঁসের অন্যতম নেতা হিসাবে পরিচিত?

২. নীচের প্রশ্নগুলির উত্তর নিজের ভাষায় লেখো :

২.১ স্বাধীনতা বলতে কী বোঝো? কী কী বিষয়ে মানুষের স্বাধীনতা প্রয়োজন বলে তুমি মনে করো?

২.২ মানুষ পরাধীন হয় কখন?

২.৩ পরাধীন মানুষের স্বাধীনতা পাওয়ার পথগুলি কী কী?

২.৪ 'স্বাধীনতা' কবিতাটির মধ্যে দুটি 'পক্ষ' আছে— 'আমি-পক্ষ' আর 'তুমি-পক্ষ'। এই 'আমি পক্ষ' আর 'তুমি-পক্ষ' — এর স্বরূপ বিশ্লেষণ করো। এই ক্ষেত্রে 'সে পক্ষ' নেই কেন?

২.৫ 'সময়ে/সবই হবে, কাল একটা নূতন দিন'— কবিতার মধ্যে উদ্ধৃতিচিহ্নের ভিতরে থাকা কথাটি কার/কাদের কথা বলে তোমার মনে হয়? তারা এ ধরনের কথা বলেন কেন?

২.৬ 'আগামীকালের রুটি/ দিয়ে কি আজ বাঁচা যায়'— এখানে 'আগামীকাল' আর 'আজ' বলতে কী বোঝানো হয়েছে?

শব্দার্থ : সমঝোতা — আপোস। কাঠা — জমির পরিমাণ বিশেষ (প্রায় ৭২০ বর্গফুট)।

৩. নিম্নলিখিত পঙ্‌ক্তিগুলির তাৎপর্য বিশ্লেষণ করো :

৩.১ মৃত্যুর পরে তো আমার .... প্রয়োজন হবে না।

৩.২ স্বাধীনতা একটা শক্তিশালী বীজপ্রবাহ।

৩.৩ আমাদেরও তো অন্য সকলের .... জমির মালিকানার।

৩.৪ স্বাধীনতা আমার প্রয়োজন/তোমার যেমন।

৪. নীচের প্রতিটি শব্দের ব্যাসবাক্যসহ সমাস নির্ণয় করো :

স্বাধীনতা, দুকাঠা, আগামীকাল, বীজপ্রবাহ

৫. স্বাধীনতা নিয়ে লেখা আরো দুটো কবিতার উল্লেখ করো এবং এই কবিতার সঙ্গে তাদের তুলনামূলক আলোচনা করো।

আদাব

সমরেশ বসু

রাত্রির নিস্তব্ধতাকে কাঁপিয়ে দিয়ে মিলিটারি টহলদার গাড়িটা একবার ভিক্টোরিয়া পার্কের পাশ দিয়ে একটা পাক খেয়ে গেল।

শহরে ১৪৪ ধারা আর কারফিউ অর্ডার জারি হয়েছে। দাঙ্গা বেধেছে হিন্দু আর মুসলমানে। মুখোমুখি লড়াই দা, সড়কি, ছুরি, লাঠি নিয়ে। তা ছাড়া চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়েছে গুপ্তঘাতকের দল — চোরাগোপ্তা হানছে অন্ধকারকে আশ্রয় করে।

লুঠেরা-রা বেরিয়েছে তাদের অভিযানে। মৃত্যু-বিভীষিকাময় এই অন্ধকার রাত্রি তাদের উল্লাসকে তীব্রতর করে তুলছে। বস্তিতে বস্তিতে জ্বলছে আগুন। মৃত্যুকাতর নারী-শিশুর চীৎকার স্থানে স্থানে আবহাওয়াকে বীভৎস করে তুলছে। তার উপর এসে ঝাঁপিয়ে পড়ছে সৈন্যবাহী-গাড়ি। তারা গুলি ছুঁড়ছে দিগ্‌বিদিক্ জ্ঞানশূন্য হয়ে আইন ও শৃঙ্খলা বজায় রাখতে।

দুদিক থেকে দুটো গলি এসে মিশেছে এ জায়গায়। ডাস্টবিন্‌টা উল্টে এসে পড়েছে গলি দু'টোর মাঝখানে খানিকটা ভাঙাচোরা অবস্থায়। সেটাকে আড়াল করে গলির ভিতর থেকে হামাগুড়ি দিয়ে বেরিয়ে এল একটি লোক। মাথা তুলতে সাহস হলো না, নির্জীবের মতো পড়ে রইল খানিকক্ষণ। কান পেতে রইল দূরের অপরিস্ফুট কলরবের দিকে। কিছুই বোঝা যায় না। —'আল্লাহু-আকবর' কি 'বন্দোমাতরম্'।

হঠাৎ ডাস্টবিন্‌টা একটু নড়ে উঠল। আচম্বিতে শিরশিরিয়ে উঠল দেহের সমস্ত শিরা-উপশিরা। দাঁতে দাঁত চেপে হাত পা-গুলোকে কঠিন করে লোকটা প্রতীক্ষা করে রইল একটা ভীষণ কিছুর জন্য। কয়েকটা মুর্হূত কাটে। ...নিশ্চল নিস্তব্ধ চারিদিক।

বোধহয় কুকুর। তাড়া দেওয়ার জন্যে লোকটা ডাস্টবিন্‌টাকে ঠেলে দিল একটু। খানিকক্ষণ চুপচাপ। আবার নড়ে উঠল ডাস্টবিন্‌টা, ভয়ের সঙ্গে এবার একটু কৌতূহল হলো। আস্তে আস্তে মাথা তুলল লোকটা ... ওপাশ থেকেও উঠে এল ঠিক তেমনি একটি মাথা। মানুষ! ডাস্টবিনের দুই পাশে দুটি প্রাণী, নিস্পন্দ নিশ্চল। হৃদয়ের স্পন্দন তালহারা—ধীর...। স্থির চারটে চোখের দৃষ্টি ভয়ে সন্দেহে উত্তেজনায় তীব্র হয়ে উঠেছে। কেউ কাউকে বিশ্বাস করতে পারছে না। উভয়ে উভয়কে ভাবছে খুনি। চোখে চোখ রেখে উভয়েই একটা আক্রমণের প্রতীক্ষা করতে থাকে, কিন্তু খানিকক্ষণ অপেক্ষা করেও কোনো পক্ষ থেকেই আক্রমণ এল না। এবার দুজনের মনেই একটা প্রশ্ন জাগল— হিন্দু, না মুসলমান? এ প্রশ্নের উত্তর পেলেই হয় তো মারাত্মক পরিণতিটা দেখা দেবে। তাই সাহস করছে না কেউ কাউকে সে কথা জিজ্ঞেস করতে। প্রাণভীত দুটি প্রাণী পালাতেও পারছে না—ছুরি হাতে আততায়ীর ঝাঁপিয়ে পড়ার ভয়ে।

অনেকক্ষণ এই সন্দিহান ও অস্বস্তিকর অবস্থায় দুজনেই অধৈর্য হয়ে পড়ে। একজন শেষ অবধি প্রশ্ন করে ফেলে—হিন্দু, না মুসলমান?

—আগে তুমি কও। অপর লোকটি জবাব দেয়।

পরিচয়কে স্বীকার করতে উভয়েই নারাজ। সন্দেহের দোলায় তাদের মন দুলছে। ...প্রথম প্রশ্নটা চাপা পড়ে, অন্য কথা আসে। একজন জিজ্ঞেস করে,—বাড়ি কোন্‌খানে?

—বুড়িগঙ্গার হেইপারে—সুবইডায়। তোমার?

---চাষাড়া---নারাইণগঞ্জের কাছে।...কী কাম করো?

—নাও আছে আমার, না'য়ের মাঝি।—তুমি?

—নারাইণগঞ্জের সুতাকলে কাম করি।

আবার চুপচাপ। অলক্ষ্যে অন্ধকারের মধ্যে দু'জনে দু'জনের চেহারাটা দেখবার চেষ্টা করে। চেষ্টা করে উভয়ের পোশাক-পরিচ্ছদটা খুঁটিয়ে দেখতে। অন্ধকার আর ডাস্টবিনটার আড়াল সেদিক থেকে অসুবিধা ঘটিয়েছে।...হঠাৎ কাছাকাছি কোথায় একটা শোরগোল ওঠে। শোনা যায় দুপক্ষেরই উন্মত্ত কণ্ঠের ধ্বনি। সুতাকলের মজুর আর নাওয়ের মাঝি দুজনেই সন্ত্রস্ত হয়ে একটু নড়েচড়ে ওঠে।

—ধারে-কাছেই য্যান লাগছে। সুতা-মজুরের কণ্ঠে আতঙ্ক ফুটে উঠল।

—হ্, চল এইখান থেইক্যা উইঠা যাই। মাঝিও বলে উঠল অনুরূপ কণ্ঠে।

সুতা-মজুর বাধা দিল: আরে, না না—উইঠো না। জানটারে দিবা নাকি?

মাঝির মন আবার সন্দেহে দুলে উঠল। লোকটার কোনো বদ্ অভিপ্রায় নেই তো! সুতা মজুরের চোখের দিকে তাকাল সে। সুতা-মজুরও তাকিয়েছিল, চোখে চোখ পড়তেই বলল---বইয়ো। যেমুন বইয়া রইছ—সেই রকমই থাকো।

মাঝির মনটা ছাঁৎ করে উঠল সুতা-মজুরের কথায়। লোকটা কি তাহলে তাকে যেতে দেবে না নাকি। তার সারা চোখে সন্দেহ আবার ঘনিয়ে এল। জিজ্ঞেস করল—ক্যান্?

—ক্যান্? সুতা-মজুরের চাপা গলায় বেজে উঠল—ক্যান্ কি, মরতে যাইবা নাকি তুমি?

কথা বলার ভঙ্গিটা মাঝির ভালো ঠেকল না। সম্ভব-অসম্ভব নানারকম ভেবে সে মনে মনে দৃঢ় হয়ে উঠল। —যামু না কি এই আন্দাইরা গলির ভিতরে পইড়া থাকুম নাকি?

লোকটার জেদ দেখে সুতা-মজুরের গলায়ও ফুটে উঠল সন্দেহ। বলল—তোমার মতলবডা তো ভালো মনে হইতেছে না। কোন জাতির লোক তুমি কইলা না, শেষে তোমাগো দলবল যদি ডাইকা লইয়া আহ আমারে মারণের লেইগা?

—এইটা কেমুন কথা কও তুমি? স্থান-কাল ভুলে রাগে-দুঃখে মাঝি প্রায় চেঁচিয়ে ওঠে।

—ভালো কথাই কইছি ভাই; বইয়ো, মানুষের মন বোঝো না?

সুতা-মজুরের গলায় যেন কী ছিল, মাঝি একটু আশ্বস্ত হলো শুনে।

—তুমি চইলা গেলে আমি একলা থাকুম নাকি?

শোরগোলটা মিলিয়ে গেল দূরে। আবার মৃত্যুর মতো নিস্তব্ধ হয়ে আসে সব—মুহূর্তগুলিও কাটে যেন মৃত্যুর প্রতীক্ষার মতো। অন্ধকারে গলির মধ্যে ডাস্টবিনের দুই পাশে দুটি প্রাণী ভাবে নিজেদের বিপদের কথা, ঘরের কথা, মা-বউ ছেলেমেয়েদের কথা... তাদের কাছে কি আর তারা প্রাণ নিয়ে ফিরে যেতে পারবে, না তারাই থাকবে বেঁচে...কথা নেই, বার্তা নেই, হঠাৎ কোত্থেকে বজ্রপাতের মতো নেমে এল দাঙ্গা। এই হাটে-বাজারে দোকানে এত হাসাহাসি, কথাকওয়াকওয়ি—আবার মুহূর্ত পরেই মারামারি, কাটাকাটি—একেবারে রক্তগঙ্গা বইয়ে দিল সব। এমনভাবে মানুষ নির্মম নিষ্ঠুর হয়ে ওঠে কী করে? কি অভিশপ্ত জাত! সুতা-মজুর একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে। দেখাদেখি মাঝিরও একটা নিশ্বাস পড়ে।

—বিড়ি খাইবা? সুতা-মজুর পকেট থেকে একটি বিড়ি বের করে বাড়িয়ে দিলো মাঝির দিকে। মাঝি বিড়িটা নিয়ে অভ্যাসমতো দু'একবার টিপে, কানের কাছে বার কয়েক ঘুরিয়ে চেপে ধরল ঠোটের ফাঁকে। সুতা-মজুর তখন দেশলাই জ্বালাবার চেষ্টা করছে। আগে লক্ষ করেনি জামাটা কখন ভিজে গেছে। দেশলাইটাও গেছে সেঁতিয়ে। বার কয়েক খস্‌খস্ শব্দের মধ্যে শুধু এক-আধটা নীলচে ঝিলিক দিয়ে উঠল। বারুদ ঝরা কাঠিটা ফেলে দিল বিরক্ত হয়ে।

—হালার ম্যাচবাতিও গেছে সেঁতাইয়া। —আর একটা কাঠি বের করল সে।

মাঝি যেন খানিকটা অসবুর হয়েই উঠে এল সুতা-মজুরের পাশে।

—আরে জ্বলব জ্বলব, দেও দেহিনি—আমার কাছে দেও। সুতা-মজুরের হাত থেকে দেশলাইটা সে প্রায় ছিনিয়েই নিল। দু'একবার খস্‌খস্ করে সত্যিই সে জ্বালিয়ে ফেলল একটা কাঠি।

—সোহান্ আল্লা! —নেও নেও—ধরাও তাড়াতাড়ি।...ভূত দেখার মতো চমকে উঠল সুতা-মজুর। টেপা

ঠোঁটের ফাঁক থেকে পড়ে গেল বিড়িটা।

—তুমি...?

একটা হালকা বাতাস এসে যেন ফুঁ দিয়ে নিভিয়ে দিল কাঠিটা। অন্ধকারের মধ্যে দু'জোড়া চোখ অবিশ্বাসে উত্তেজনায় আবার বড়ো বড়ো হয়ে উঠল। কয়েকটা নিস্তব্ধ পল কাটে।

মাঝি চট্ করে উঠে দাঁড়াল। বলল—হ আমি মোছলমান। —কী হইছে?

সুতা-মজুর ভয়ে ভয়ে জবাব দিল—কিছু হয় নাই, কিন্তু...

মাঝির বগলের পুঁটলিটা দেখিয়ে বলল, ওইটার মধ্যে কী আছে?

—পোলা-মাইয়ার লেইগা দুইটা জামা আর একখান শাড়ি। কাইল আমাগো ঈদের পরব জানো?

—আর কিছু নাই তো ! —সুতা-মজুরের অবিশ্বাস দূর হতে চায় না।

—মিথ্যা কথা কইতেছি নাকি? বিশ্বাস না হয় দেখো। পুঁটলিটা বাড়িয়ে দিল সে সুতা-মজুরের দিকে।

—আরে না না ভাই, দেখুম আর কী। তবে দিনকালটা দেখছ তো? বিশ্বাস করন যায়— তুমিই কও?

হেই ত' হক্ কথাই। ভাই—তুমি কিছু রাখ-টাখ নাই তো?

—ভগবানের কিরা কইরা কইতে পারি একটা সুঁইও নাই। পরানটা লইয়া অখন ঘরের পোলা ঘরে ফিরা যাইতে পারলে হয়। সুতা-মজুর তার জামা কাপড় নেড়েচেড়ে দেখায়।

—আইচ্ছা...মাঝি এমনভাবে কথা বলে যেন সে তার কোনো আত্মীয়বন্ধুর সঙ্গে কথা বলছে।

—আইচ্ছা—আমারে কইতে পারনি—এই মাই'র দ'ইর কাটাকুটি কিয়ের লেইগা?

সুতা-মজুর খবরের কাগজের সঙ্গে সম্বন্ধ রাখে, খবরাখবর সে জানে কিছু। বেশ একটু উষ্মকণ্ঠেই জবাব দিল সে—দোষ তো তোমাগো ওই লিগওয়ালোগোই। তারাই তো লাগাইছে হেই কিয়ের সংগ্রামের নাম কইরা।

মাঝি একটু কটূক্তি করে উঠল—হেই সব আমি বুঝি না। আমি জিগাই মারামারি কইরা হইব কী। তোমাগো দু'গা লোক মরব, আমাগো দু'গা মরব। তাতে দ্যাশের কী উপকারটা হইব?

—আরে আমিও তো হেই কথাই কই। হইব আর কী, হইব আমার এই কলাটা—হাতের বুড়ো আঙুল দেখায় সে। —তুমি মরবা, আমি মরুম, আর আমাগো পোলামাইয়াগুলি ভিক্ষা কইরা বেড়াইব। এই গেল সনের 'রায়টে' আমার ভগ্নিপতিরে কাইটা চাইর টুকরা কইরা মারল। ফলে বইন হইল বিধবা আর তার পোলামাইয়ারা আইয়া পড়ল আমার ঘাড়ের উপুর। কই কি আর সাধে। ন্যাতারা হেই সাততলার উপুর পায়ের উপুর পা দিয়ে হুকুম জারি কইরা বইয়া রইল আর হালার মরতে মরলাম আমরাই।

—মানুষ না, আমরা য্যান কুত্তার বাচ্চা হইয়া গেছি; নাইলে এমুন কামড়া-কামড়িটা লাগে কেম্‌বায়? —নিষ্ফল ক্রোধে মাঝি দু'হাত দিয়ে হাঁটু দু'টোকে জড়িয়ে ধরে।

—হ।

—আমাগো কথা ভাবে কেডা? এই যে দাঙ্গা বাধল—অখন দানা জুটাইব কোন্ সুমুন্দি ; নাওটারে কি আর ফিরা পামু? বাদামতলির ঘাটে কোন্ অতলে ডুবাইয়া দিছে তারে—তার ঠিক কি? জমিদার রূপবাবুর বাড়ির নায়েবমশয় পিত্যেক মাসে একবার কইরা আমার নায়ে যাইত নইরার চরে কাছারি করতে। বাবুর হাত য্যান্ হজরতের হাত, বখশিশ দিত পাঁচ, নায়ের কেরায়া দিত পাঁচ, একুনে' দশটা টাকা। তাই আমার মাসের খোরাকি জুটাইত হেই বাবু। আর কি হিন্দুবাবু আইব আমার নায়ে।

সুতা-মজুর কী বলতে গিয়ে থেমে গেল। একসঙ্গে অনেকগুলি ভারী বুটের শব্দ শোনা যায়। শব্দ যেন বড়ো রাস্তা থেকে গলির অন্দরের দিকেই এগিয়ে আসছে সে বিষয়ে আর সন্দেহ নেই। শঙ্কিত জিজ্ঞাসা নিয়ে উভয়ে চোখাচোখি করে।

—কী করব? মাঝি তাড়াতাড়ি পুঁটলিটাকে বগলদাবা করে।

—চলো পলাই। কিন্তুক যামু কোন্‌দিকে? শহরের রাস্তাঘাট তো ভালো চিনি না।

মাঝি বলল, চলো যেদিকে হউক। মিছামিছি পুলিশের মাইর খামু না, —ওই ঢ্যামনাগো বিশ্বাস নাই।

—হ। ঠিক কথাই কইছ। কোন্‌দিকে যাইবা কও—আইয়া তো পড়ল।

—এইদিকে।—

গলিটার যে মুখটা দক্ষিণ দিকে চলে গেছে সেদিকে পথনির্দেশ করল মাঝি। বলল, চলো, কোনো গতিকে একবার যদি বাদামতলি ঘাটে গিয়া উঠতে পারি—তাইলে আর ডর নাই।

মাথা নিচু করে মোড়টা পেরিয়ে ঊর্ধ্বশ্বাসে তারা ছুটল, সোজা এসে উঠল একেবার পাটুয়াটুলি রোডে। নিস্তব্ধ রাস্তা ইলেকট্রিকের আলোয় ফুট্‌ফুট্ করছে। দুইজনেই একবার থম্‌কে দাঁড়াল—ঘাপটি মেরে নেই তো কেউ? কিন্তু দেরি করারও উপায় নেই। রাস্তার এমোড়-ওমোড় একবার দেখে নিয়ে ছুটল সোজা পশ্চিমদিকে। খানিকটা এগিয়ে এমন সময় তাদের পিছনে শব্দ উঠল ঘোড়ার খুরের। তাকিয়ে দেখল—অনেকটা দূরে একজন অশ্বারোহী এদিকেই আসছে। ভাববার সময় নেই। বাঁ-পাশে মেথর যাতায়াতের সরু গলির মধ্যে আত্মগোপন করল তারা। একটু পরেই ইংরেজ অশ্বারোহী রিভালবার হাতে তীব্র বেগে বেরিয়ে গেল তাদের বুকের মধ্যে অশ্ব-খুরধ্বনি তুলে দিয়ে। শব্দ যখন চলে গেল অনেক দূরে, উঁকি-ঝুঁকি মারতে মারতে আবার তারা বেরুল।

—কিনারে কিনারে চলো। সুতা-মজুর বলে।

রাস্তার ধার ঘেঁষে সন্ত্রস্ত দ্রুতগতিতে এগিয়ে চলে তারা।

—খাড়াও। —মাঝি চাপা-গলায় বলে। সুতা-মজুর চমকে থমকে দাঁড়ায়।

—কী হইল?

—এদিকে আইয়ো—সুতা-মজুরের হাত ধরে মাঝি তাকে একটা পানবিড়ির দোকানের আড়ালে নিয়ে গেল।

হেদিকে দেখো।

মাঝির সঙ্কেত মতো সামনের দিকে তাকিয়ে সুতা-মজুর দেখল প্রায় একশো গজ দূরে একটা ঘরে আলো জ্বলছে। ঘরের সংলগ্ন উঁচু বারান্দায় দশ বারোজন বন্দুকধারী পুলিশ স্থাণুর মতো দাঁড়িয়ে আছে, আর তাদের সামনে ইংরেজ অফিসার কী যেন বলছে অনর্গল পাইপের ধোঁয়ার মধ্যে হাত মুখ নেড়ে। বারান্দার নীচে ঘোড়ার জিন্ ধরে দাঁড়িয়ে আছে আর একটি পুলিশ। অশান্ত চঞ্চল ঘোড়া কেবলি পা ঠুকছে মাটিতে।

মাঝি বলে—ওইটা ইসলামপুর ফাঁড়ি। একটু আগাইয়া গেলে ফাঁড়ির কাছেই বাঁয়ের দিকে যে গলি গেছে হেই পথে যাইতে হইব আমাগো বাদামতলির ঘাট।

সুতা-মজুরের সমস্ত মুখ আতঙ্কে ভরে উঠল।—তবে?

—তাই কইতাছি তুমি থাকো, ঘাটে গিয়া তোমার বিশেষ কাম হইব না। মাঝি বলে, এইটা হিন্দুগো আস্তানা আর ইসলামপুর হইল মুসলমানগো। কাইল সকালে উইঠা বাড়িত যাইবা গা।

—আর তুমি?

—আমি যাইগা। মাঝির গলা উদ্বেগে আর আশঙ্কায় ভেঙে পড়ে।—আমি পারুম না ভাই থাকতে। আইজ আটদিন ঘরের খবর জানি না। কী হইল না হইল আল্লাই জানে। কোনোরকম কইরা গলিতে ঢুকতে পারলেই হইল। নৌকা না পাই সাঁতরাইয়া পার হমু বুড়িগঙ্গা।

—আরে না না মিয়া করো কী? উৎকণ্ঠায় সুতা-মজুর মাঝির কামিজ চেপে ধরে।

—কেমনে যাইবা তুমি, আঁ? আবেগ উত্তেজনায় মাঝির গলা কাঁপে।

—ধইরো না, ভাই ছাইড়া দেও। বোঝ না তুমি কাইল ঈদ্, পোলামাইয়ারা সব আইজ চান্দ্ দেখছে। কত আশা কইরা রইছে তারা নতুন জামা পিনব, বাপজানের কোলে চড়ব। বিবি চোখের জলে বুক ভাসাইতেছে। পারুম না ভাই—পারুম না—মনটা কেমন করতাছে। মাঝির গলা ধরে আসে। সুতা-মজুরের বুকের মধ্যে টনটন্ করে ওঠে। কামিজ ধরা হাতটা শিথিল হয়ে আসে।

—যদি তোমায় ধইরা ফেলায়?—ভয়ে আর অনুকম্পায় তার গলা ভরে ওঠে।

—পারব না ধরতে, ডরাইও না। এইখান থাইকা য্যান উইঠো না। যাই...ভুলুম না ভাই এই রাত্রের কথা। নসিবে থাকলে আবার তোমার লগে মোলাকাত হইব। —আদাব।

—আমিও ভুলুম না ভাই—আদাব।

মাঝি চলে গেল পা টিপে টিপে।

সুতা-মজুর বুকভরা উদ্বেগ নিয়ে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। বুকের ধুক্‌ধুকুনি তার কিছুতে বন্ধ হতে চায় না। উৎকর্ণ হয়ে রইল সে, ভগমান্— মাজি য্যান্ বিপদে না পড়ে।

মুহূর্তগুলি কাটে রুদ্ধ-নিশ্বাসে। অনেকক্ষণ তা' হলো, মাঝি বোধহয় এতক্ষণে চলে গেছে।

আহা 'পোলামাইয়ার' কত আশা নতুন জামা পরবে, আনন্দ করবে পরবে। বেচারা 'বাপজানের' পরান তো। সুতা-মজুর একটা নিশ্বাস ফেলে। সোহাগে আর কান্নায় বিবি ভেঙে পড়বে মিয়াসাহেবের বুকে।

'মরণের মুখ থেইকা তুমি বাঁইচা আইছ?' —সুতা-মজুরের ঠোঁটের কোণে একটু হাসি ফুটে উঠল, আর মাঝি তখন কী করবে? মাঝি তখন—

—হলট্...

ধ্বক্ করে উঠল সুতা-মজুরের বুক। বুট পায়ে কারা যেন ছুটোছুটি করছে। কী যেন বলাবলি করছে চীৎকার করে।

—ডাকু ভাগ্‌তা হ্যায়।

সুতা-মজুর গলা বাড়িয়ে দেখল পুলিশ অফিসার রিভলবার হাতে রাস্তার উপর লাফিয়ে পড়ল। সমস্ত অঞ্চলটার নৈশ নিস্তব্ধতাকে কাঁপিয়ে দুবার গর্জে উঠল অফিসারের আগ্নেয়াস্ত্র।

গুড়ুম, গুড়ুম। দুটো নীল্‌চে আগুনের ঝিলিক। উত্তেজনায় সুতা-মজুর হাতের একটা আঙুল কামড়ে ধরে। লাফ দিয়ে ঘোড়ায় উঠে অফিসার ছুটে গেল গলির ভিতর। ডাকুটার মরণ আর্তনাদ সে শুনতে পেয়েছে।

সুতা-মজুরের বিহ্বল চোখে ভেসে উঠল মাঝির বুকের রক্তে তার পোলামইয়ার, তার বিবির জামা শাড়ি রাঙা হয়ে উঠেছে। মাঝি বলছে—পারলাম না ভাই। আমার ছাওয়ালরা আর বিবি চোখের পানিতে ভাসব পরবের দিনে। দুশমনরা আমারে যাইতে দিল না তাগো কাছে।

হাতেকলমে

সমরেশ বসু (১৯২৪ — ১৯৮৮) : আধুনিক বাংলা সাহিত্যের অন্যতম ছোটোগল্পকার ও ঔপন্যাসিক। জীবনযাপনের বিভিন্ন পর্বে তিনি বিচিত্র পেশা অবলম্বন করে নানান অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছিলেন। ফেরিওয়ালা থেকে চটকলের শ্রমিক, বস্তির এঁদো ঘর থেকে সুরম্য দালান — সর্বত্রই ছিল তাঁর অনায়াস বিচরণ। তাঁর উপন্যাসগুলির মধ্যে *বি টি রোডের ধারে, গঙ্গা, শেকল ছেঁড়া হাতের খোঁজে, জগদ্দল , মহাকালের রথের ঘোড়া* ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। *কালকূট* ছদ্মনামে তিনি অনেক ভ্রমণ কাহিনিও লিখেছেন।

১.১ সমরেশ বসুর ছদ্মনাম কী?

১.২ তাঁর লেখা দুটি উপন্যাসের নাম লেখো।

২. **নীচের প্রশ্নগুলির একটি বাক্যে উত্তর দাও :**

২.১ কোন সময়পর্বের কথা গল্পে রয়েছে?

২.২ 'ডাস্টবিনের দুই পাশে দুটি প্রাণী' — প্রাণীদুটির পরিচয় দাও?

২.৩ 'ওইটার মধ্যে কী আছে?' — বক্তা কীসের প্রতি ইঙ্গিত করে?

২.৪ গল্পে কোন নদীর প্রসঙ্গ রয়েছে?

২.৫ 'সুতা-মজুরের ঠোঁটের কোণে একটু হাসি ফুটে উঠল ...' — তার এই হাসির কারণ কী?

৩. **নীচের প্রশ্নগুলির উত্তর নিজের ভাষায় লেখো:**

৩.১ 'শহরে ১৪৪ ধারা আর কারফিউ অর্ডার জারী হয়েছে।' — লেখকের অনুসরণে গল্পঘটনার রাতের দৃশ্য বর্ণনা করো।

৩.২ 'হঠাৎ ডাস্টবিনটা একটু নড়ে উঠল।' — 'ডাস্টবিন নড়ে ওঠা'র অব্যবহিত পরে কী দেখা গেল?

৩.৩ হিন্দু-মুসলমান সম্প্রীতির আবহ গল্পে কীভাবে রচিত হয়েছে তা বিশ্লেষণ করো।

৩.৪ 'মুহূর্তগুলিও কাটে যেন মৃত্যুর প্রতীক্ষার মতো।' — সেই রুদ্ধ উত্তেজনাকর মুহূর্তগুলির ছবি গল্পে কীভাবে ধরা পড়েছে তা দৃষ্টান্তসহ আলোচনা করো।

৩.৫ 'এমনভাবে মানুষ নির্মম নিষ্ঠুর হয়ে ওঠে কী করে?' — উদ্ধৃতিটির আলোকে সেই সময়ের ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটটি আলোচনা করো।

৪. **নিম্নলিখিত বাক্যগুলির তাৎপর্য বিশ্লেষণ করো:**

৪.১ 'রাত্রির নিস্তব্ধতাকে কাঁপিয়ে দিয়ে মিলিটারি টহলদার গাড়িটা একবার ভিক্টোরিয়া পার্কের পাশ দিয়ে একটা পাক খেয়ে গেল।'

৪.২ 'ডাস্টবিনের দুইপাশে দুটি প্রাণী, নিস্পন্দ নিশ্চল।'

৪.৩ 'স্থান-কাল ভুলে রাগে-দুঃখে মাঝি প্রায় চেঁচিয়ে ওঠে।'

৪.৪ 'অন্ধকারের মধ্যে দু জোড়া চোখ অবিশ্বাসে উত্তেজনায় আবার বড়ো বড়ো হয়ে উঠল।'

৪.৫ 'সুতো-মজুরের বুকের মধ্যে টনটন করে ওঠে।'

৪.৬ 'ভুলুম না ভাই এই রাত্রের কথা।'

শব্দার্থ : আন্দাইরা গলি — অন্ধকার গলি। অসবুর — অধৈর্য। সুঁই — সূঁচ। ভগবানের কিরা — ভগবানের দিব্য বা শপথ। রায়ট — দাঙ্গা। পোলামাইয়া — ছেলেমেয়ে। ছাওয়াল — ছেলে। দুশমন — শত্রু। তাগো — তাদের।

৫. নীচের বাক্যগুলি থেকে অব্যয় পদ খুঁজে নিয়ে কোনটি কোন শ্রেণির অব্যয় তা নির্দেশ করো:

৫.১ শহরে ১৪৪ ধারা আর কারফিউ অর্ডার জারি হয়েছে।

৫.২ তারা গুলি ছুঁড়ছে দিগ্‌বিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে আইন ও শৃঙ্খলা বজায় রাখতে।

৫.৩ উভয়েই একটা আক্রমণের প্রতীক্ষা করতে থাকে, কিন্তু খানিকক্ষণ অপেক্ষা করেও কোনো পক্ষ থেকেই আক্রমণ এল না।

৫.৪ তোমার মতলবডা তো ভালো মনে হইতেছে না।

৫.৫ মাঝি এমনভাবে কথা বলে যেন সে তার কোনো আত্মীয়বন্ধুর সঙ্গে কথা বলছে।

৬. নীচের বাক্যগুলি থেকে সন্ধিবদ্ধ পদ খুঁজে নিয়ে তাদের সন্ধিবিচ্ছেদ করো:

৬.১ তা ছাড়া চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়েছে গুপ্তঘাতকের দল।

৬.২ মৃত্যু-বিভীষিকাময় এই অন্ধকার রাত্রি তাদের উল্লাসকে তীব্রতর করে তুলেছে।

৬.৩ নির্জীবের মতো পড়ে রইল খানিকক্ষণ।

৬.৪ দাঁতে দাঁত চেপে হাত পা-গুলোকে কঠিন করে লোকটা প্রতীক্ষা করে রইল একটা ভীষণ কিছুর জন্য।

৬.৫ সমস্ত অঞ্চলটার নৈশ নিস্তব্ধতাকে কাঁপিয়ে দুবার গর্জে উঠল অফিসারের আগ্নেয়াস্ত্র।

৭. ব্যাসবাক্যসহ সমাসের নাম লেখো :

চোরাগোপ্তা, পথনির্দেশ, নির্জীব, দীর্ঘনিশ্বাস, পোলামাইয়া।

৮. নিম্নরেখাঙ্কিত অংশের কারক-বিভক্তি নির্দেশ করো :

৮.১ দুদিক থেকে দুটো গলি এসে মিশেছে এ জায়গায়।

৮.২ সন্দেহের দোলায় তাদের মন দুলছে।

৮.৩ নিষ্ফল ক্রোধে মাঝি দু হাত দিয়ে হাঁটু দুটোকে জড়িয়ে ধরে।

৮.৪ আমাগো কথা ভাবে কেডা?

৮.৫ মুহূর্তগুলি কাটে রুদ্ধ নিশ্বাসে।।

৯. নীচের শব্দগুলিতে ধ্বনি পরিবর্তনের কোন কোন নিয়ম কাজ করেছে লেখো :

হেইপারে, নারাইনগঞ্জ, ডাইকা, আঙুল, চান্দ।

১০. নির্দেশ অনুযায়ী বাক্য পরিবর্তন করো :

১০.১ রাত্রির নিস্তব্ধতাকে কাঁপিয়ে দিয়ে মিলিটারি টহলদার গাড়িটা একবার ভিক্টোরিয়া পার্কের পাশ দিয়ে একটা পাক খেয়ে গেল। (জটিল বাক্যে)

১০.২ খানিকক্ষণ চুপচাপ। (না-সূচক বাক্যে)

১০.৩ পরিচয়কে স্বীকার করতে উভয়েই নারাজ। (প্রশ্নবোধক বাক্যে)

১০.৪ শোরগোলটা মিলিয়ে গেল দূরে। (যৌগিক বাক্যে)

১০.৫ মাঝি বলল, চল যেদিক হউক। (পরোক্ষ উক্তিতে)

১১. ক্রিয়ার কাল নির্দেশ করো :

১১.১ কান পেতে রইল দূরের অপরিস্ফুট কলরবের দিকে।

১১.২ সন্দেহের দোলায় তাদের মন দুলছে।

১১.৩ ধারে-কাছেই য্যান লাগছে।

১১.৪ অশান্ত চঞ্চল ঘোড়া কেবলি পা ঠুকছে মাটিতে।

১১.৫ বাদামতলির ঘাটে কোন অতলে ডুবাইয়া দিছে তারে —

১২. নীচের শব্দগুলির শ্রেণিবিভাগ করো :

মজুর, লীগওয়ালো, পুলিশ, নসিব, রাত্রি।

ভয় কি মরণে

ভয় কি মরণে রাখিতে সন্তানে,
মাতঙ্গী মেতেছে আজ সমর রঙ্গে॥
তাথৈ তাথৈ থৈ দ্রিমি দ্রিমি দং দং,
ভূত পিশাচ নাচে যোগিনী সঙ্গে।
দানব-দলনী হয়ে উন্মাদিনী,
আর কি দানব থাকিবে বঙ্গে॥
সাজ রে সন্তান হিন্দু মুসলমান,
থাকে থাকিবে প্রাণ না হয় যাইবে প্রাণ।
লইয়ে কৃপাণ হও রে আগুয়ান,
নিতে হয় মুকুন্দে-রে নিয়ো রে সঙ্গে॥

মুকুন্দদাস

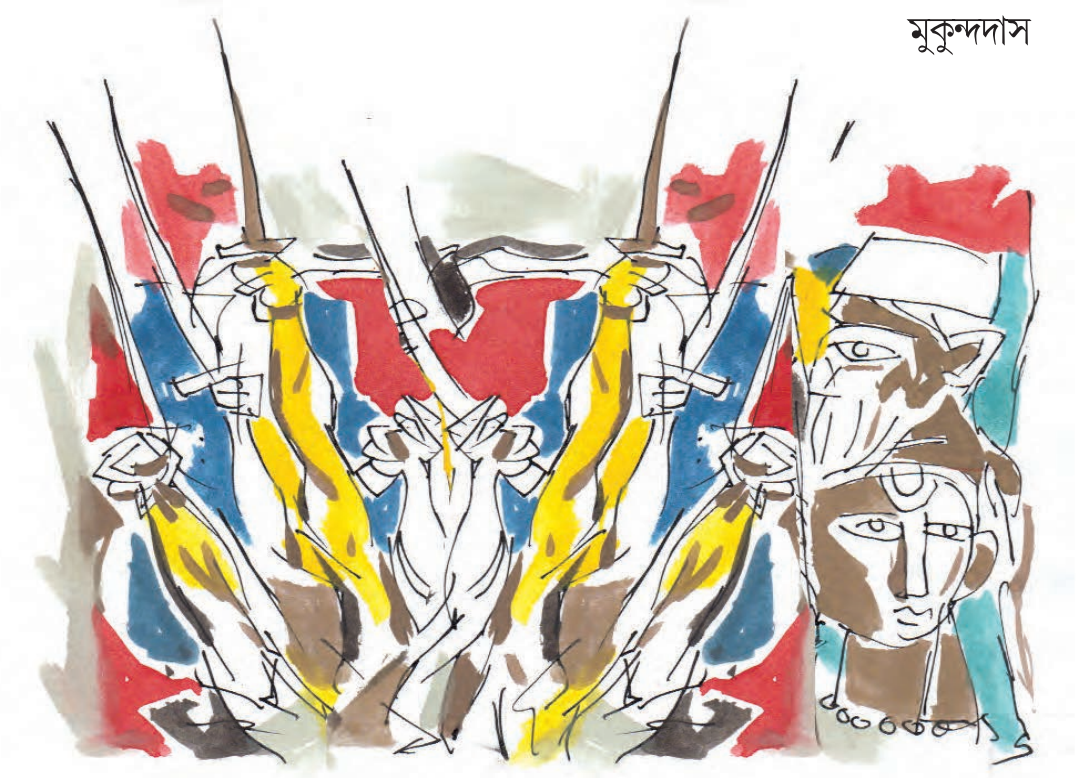

শিকল-পরার গান

কাজী নজরুল ইসলাম

এই শিকল-পরা ছল মোদের এ শিকল-পরা ছল।
এই শিকল পরেই শিকল তোদের করব রে বিকল॥

তোদের বন্ধ কারায় আসা মোদের বন্দী হতে নয়,
ওরে ক্ষয় করতে আসা মোদের সবার বাঁধন-ভয়।
এই বাঁধন পরেই বাঁধন-ভয়কে করব মোরা জয়,
এই শিকলবাঁধা পা নয় এ শিকলভাঙা কল॥
তোমরা বন্ধ ঘরের বন্ধনীতে করছ বিশ্ব গ্রাস,
আর ত্রাস দেখিয়েই করবে ভাবছ বিধির শক্তি হ্রাস।
সেই ভয়-দেখানো ভূতের মোরা করব সর্বনাশ,
এবার আনব মাভৈঃ-বিজয়মন্ত্র বলহীনের বল॥

তোমরা ভয় দেখিয়ে করছ শাসন, জয় দেখিয়ে নয়;
সেই ভয়ের টুঁটিই ধরব টিপে, করব তারে লয়।
মোরা ফাঁসি পরে আনব হাসি মৃত্যু-জয়ের ফল॥

ওরে ক্রন্দন নয়, বন্ধন এই শিকল-ঝঞ্ঝনা,
এ যে মুক্তি-পথের অগ্রদূতের চরণ-বন্দনা।
এই লাঞ্ছিতেরাই অত্যাচারকে হানছে লাঞ্ছনা,
মোদের অস্থি দিয়েই জ্বলবে দেশে আবার বজ্রানল॥

হাতে কলমে

কাজী নজরুল ইসলাম (১৮৯৯-১৯৭৬) : বাংলা সাহিত্যে *বিদ্রোহী কবি* হিসাবে সমাদৃত। জন্ম বর্ধমান জেলার চুরুলিয়া গ্রামে। পিতার নাম কাজী ফকির আহমেদ। ১৯২১ খ্রিস্টাব্দে *বিদ্রোহী* কবিতা প্রকাশিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সমগ্র বাংলায় আলোড়ন সৃষ্টি হয়। মানবতার কবি নজরুল ইংরেজের শোষণ, সামাজিক অসাম্য, ধর্মীয় ভন্ডামি এবং কুসংস্কারের বিরুদ্ধে তাঁর সাহিত্যকেই হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করেছেন। হিন্দু ও মুসলিম ঐতিহ্যের মেলবন্ধনে তিনি সদাসচেষ্ট। কবিতা এবং গদ্য ব্যতিরেকে নজরুল-প্রতিভা সার্থকতা লাভ করেছিল তাঁর গানে। তিনি শ্যামাসংগীত, গজল, দেশাত্মবোধক, ইসলামি প্রভৃতি নানা ধরনের গানেরও রচয়িতা। তাঁর লেখা বইগুলি হলো — *অগ্নিবীণা, বিষের বাঁশি, সাম্যবাদী, সর্বহারা, ফণীমনসা, প্রলয়শিখা* প্রভৃতি।

পাঠ্য কবিতাটি তাঁর *বিষের বাঁশি* কাব্যগ্রন্থ থেকে নেওয়া হয়েছে।

১.১ কবি কাজী নজরুল ইসলাম কোথায় জন্মগ্রহণ করেন?

১.২ তিনি কী কী ধরনের গানের রচয়িতা?

শব্দার্থ : ক্রন্দন — কান্না। লাঞ্ছনা — নিগ্রহ , অপমান। চরণ — পা। বন্দনা — উপাসনা, আরাধনা। ঝঞ্ঝনা — ধাতব আওয়াজ। বন্ধনী — যা দিয়ে বাঁধা হয়। মাভৈঃ — ভয় নেই। অগ্রদূত — পথপ্রদর্শক। অস্থি — হাড়। বজ্রানল — বজ্রবিদ্যুতের আগুন।

২. নীচের প্রশ্নগুলির উত্তর একটি বাক্যে লেখো :

২.১ ‘শিকল-পরা ছল’ বলতে কবি প্রকৃতপক্ষে কী বোঝাতে চেয়েছেন?

২.২ ‘ক্ষয় করতে আসা মোদের সবার বাঁধন-ভয়।’

—‘বাঁধন-ভয়’ ক্ষয় করতে কারা, কোথায় এসেছেন?

২.৩ ‘মুক্তি-পথের অগ্রদূতের চরণ-বন্দনা’ কীভাবে রচিত হয়?

২.৪ ‘মোদের অস্থি দিয়েই জ্বলবে দেশে আবার বজ্রানল।’

— পঙ্‌ক্তিটিতে ‘আবার’ শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে কেন?

৩. **নীচের প্রশ্নগুলির উত্তর নিজের ভাষায় লেখো :**

৩.১ স্বাধীনতাকামী মানুষের মুক্তির বাসনা কীভাবে শিকল-পরার গান কবিতায় ধরা পড়েছে, তা আলোচনা করো।

৩.২ 'বাঁধন-ভয়কে করবো মোরা জয়' — কেন এই বাঁধন? কারা, কীভাবে এই 'বাঁধন-ভয়'কে জয় করবে?

৪. **দল বিশ্লেষণ করো :**

বন্ধনী, ঝঞ্ঝনা, বজ্রানল, সর্বনাশ, অস্থি।

৫. **ধ্বনিপরিবর্তনের কোন নিয়ম এখানে কাজ করেছে দেখাও:**

বাঁধন, পরে।

৬. **বাক্য রূপান্তর করো :**

৬.১ ভয়- দেখানো ভূতের মোরা করব সর্বনাশ। (জটিল বাক্যে)

৬.২ মোরা ফাঁসি পরে আনব হাসি মৃত্যুজয়ের ফল। (যৌগিক বাক্যে)

৬.৩ তোদের বন্ধ কারায় আসা মোদের বন্দী হতে নয়। (চলিত গদ্যে)

৭. **পদ চিহ্নিত করো :**

৭.১ তোমার বন্ধ ঘরের বন্ধনীতে করছ বিশ্বগ্রাস।

৭.২ মোরা ফাঁসি প'রে আনব হাসি মৃত্যুজয়ের ফল।

৭.৩ এবার আনব মাভৈঃ-বিজয়-মন্ত্র বলহীনের বল।

৮. **ব্যাসবাক্যসহ সমাসের নাম লেখো :**

শিকল-ঝঞ্ঝনা, চরণবন্দনা, বজ্রানল, মৃত্যুজয়।

হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়

হীরেন্দ্রনাথ দত্ত

শান্তিনিকেতন বিদ্যালয়ের প্রথম যুগে যাঁরা রবীন্দ্রনাথের আহ্বানে বিদ্যালয়ের কাজে এসে যোগ দিয়েছিলেন তাঁরা সকলেই অসাধারণ ব্যক্তি ছিলেন এমন কথা কেউ বলবে না। দু-একজন অবশ্যই অসাধারণ ছিলেন, তাঁদের কথা আলাদা। কিন্তু অন্যান্যদের বেলায় এ কথা নির্বিবাদে বলা যেতে পারে যে বিদ্যায় বুদ্ধিতে তাঁদের সমক্ষক ব্যক্তির অভাব দেশে তখনো ছিল না, এখনো নেই। অথচ নিজ নিজ ক্ষেত্রে এঁরাও অনেকেই অসাধারণ কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন। এঁরা স্বেচ্ছায় এমন-সব কার্যভার স্বহস্তে গ্রহণ করেছিলেন, আজকের সাংসারিক-বুদ্ধি-সম্পন্ন ব্যক্তিরা যাকে হঠকারিতা বলে মনে করবেন। মনে হবে আপন সাধ্যসীমা ভুলে গিয়ে তাঁরা সাধ্যাতীতের স্বপ্ন দেখেছেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত সকল অবিশ্বাসীর অবিশ্বাসকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করে আপন সাধনায় সিদ্ধিলাভ করেছেন। বাস্তবিক পক্ষে তাঁরা যেভাবে কাজ করেছেন তাকে একমাত্র সাধনা নামেই অভিহিত করা যায়, মাস-মাহিনার চাকুরে দ্বারা এ-জাতীয় কাজ কখনোই সম্ভব নয়। যে কাজে বহুজনের মিলিত প্রয়াস প্রয়োজন কখনো কখনো সম্পূর্ণ একক চেষ্টায় সে কাজ সম্পন্ন হয়েছে। কর্তা অকিঞ্চন, কীর্তি সুমহান। আপাতদৃষ্টিতে মনে হতে পারে কর্তার তুলনায় কীর্তি বহুগুণে বৃহৎ। বস্তুত তা নয়, কীর্তি কখনো কর্তাকে ছাড়িয়ে যায় না। বাহ্যত যা দৃষ্টিগোচর ছিল না সেই শক্তি তাঁদের চরিত্রের মধ্যে নিহিত ছিল। সুবৃহৎ কার্যে সব চেয়ে বেশি প্রয়োজন নিষ্ঠা এবং অভিনিবেশ। বিদ্যাবুদ্ধি তো ছিলই, তদুপরি উক্ত দুই গুণসন্নিপাতে সাধারণ মানুষের দ্বারাও অসাধারণ কার্য সম্পাদন সম্ভব হয়েছিল।

এর কৃতিত্ব অনেকাংশে শান্তিনিকেতনের প্রাপ্য, কারণ এরূপ মানুষ শান্তিনিকেতন নিজ হাতে তৈরি করেছে। আমাদের দেশে স্থান-মাহাত্ম্য বলে একটা কথা আছে; সেটা কেবলমাত্র স্থান-বিশেষের মাটি-জল-হাওয়ার গুণ নয়। সে স্থানই মহৎ যে স্থান মানুষের কাছ থেকে বড়ো কিছু দাবি করতে জানে। দাবি করবার অধিকার সব স্থানের থাকে না। সে অধিকার অর্জন করতে হয়— অর্জন করতে হয় নিজের দান-শক্তির দ্বারা। যে দিতে জানে সেই দাবি করতে জানে। আমাদের শিক্ষাক্ষেত্রে শান্তিনিকেতনের দান অপরিসীম। শান্তিনিকেতনই দেশকে প্রথম শিখিয়েছে যে বিদ্যালয় কেবলমাত্র বিদ্যাদানের স্থান নয়, বিদ্যাচর্চার স্থান; শুধু বিদ্যাচর্চা নয়, বিদ্যা-বিকিরণের স্থান। বিদ্যার্জনের পথ সুগম করে দেওয়া বিদ্যাকেন্দ্রের অন্যতম প্রধান কর্তব্য। যে সময়ে আমাদের দেশের বিশ্ববিদ্যালয় সমূহও এ-সব কথা ভাবেনি শান্তিনিকেতন বিদ্যালয় তার শৈশবেই সে-সব কথা ভেবেছে এবং সেজন্য নিজেকে প্রস্তুত করেছে। শান্তিনিকেতনের স্থান-মাহাত্ম্য বলতে এই অর্থেই বলেছি। এ ছাড়া রবীন্দ্রনাথ নিজের সর্বশক্তি নিয়োগ করেছিলেন শান্তিনিকেতনের সেবায়। সেই জোরে তিনি যাঁদের আহ্বান করেছিলেন তাঁদের কাছ থেকে নিঃসংকোচে সর্বশক্তি নিয়োগের দাবি করতে পেরেছিলেন।

হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় মশায় যখন রবীন্দ্রনাথের নির্দেশে বঙ্গীয় শব্দকোষ রচনায় প্রবৃত্ত হন তখন বঙ্গীয় পণ্ডিত সমাজে তিনি সম্পূর্ণ অপরিচিত ছিলেন। বয়সে নবীন, অভিজ্ঞতায় অপ্রবীণ, বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাপটুকু পর্যন্ত নেই, প্রামাণিক কোনো গ্রন্থ রচনা করে পাণ্ডিত্যের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হননি। এরূপ সুবৃহৎ কাজের জন্য তাঁর প্রস্তুতি কতখানি সে বিষয়ে সাধারণের মনে সংশয় থাকা স্বাভাবিক। কিন্তু দেখা যায় রবীন্দ্রনাথের মনে বিন্দুমাত্র সংশয় ছিল না; থাকলে এমন নিশ্চিন্ত মনে এই বিশাল কার্যভার তাঁর উপরে ন্যস্ত করতে পারতেন না। এই সম্পর্কে একটি কথা অনেক সময় আমার মনে হয়েছে। শান্তিনিকেতনের প্রথম যুগে রবীন্দ্রনাথের অধ্যাপক-নির্বাচন অনেকটা যেন শেক্সপিয়ারের প্লট-নির্বাচনের মতো। হাতের কাছে যেমন-তেমন একটা গল্প পেলেই হলো, শেক্সপিয়ার চোখ বুজে তাকেই গ্রহণ করেছেন। প্রতিভাবানের হাতে ছাই ধরলেও সোনা হয়ে যায়। অত্যন্ত শীর্ণ বিবর্ণ কাহিনিও রক্তমাংস-অস্থিমজ্জার সংযোগে পরিপুষ্ট হয়ে উঠেছে, রঙে রসে পূর্ণতা লাভ করেছে, নিষ্প্রাণ কাহিনি প্রাণের স্পন্দনে অপূর্ব বিস্ময়ে পরিণত হয়েছে। পণ্ডিত সমালোচকদের মতে মূল কাহিনিতে শেক্সপিয়ার ঐশ্বর্যের আভাস মাত্র ছিল না। অবশ্য এমন হওয়া অসম্ভব নয় যে একমাত্র শেক্সপিয়ারের কবিদৃষ্টিতেই সেই-সব শীর্ণ কাহিনির অনুচ্চারিত সম্ভাবনাটুকু ধরা পড়েছিল। রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কেও এ কথা প্রযোজ্য। আপাতদৃষ্টিতে যে মানুষ সাধারণ তাঁরও প্রচ্ছন্ন সম্ভাবনা রবীন্দ্রনাথের সর্বদর্শী দৃষ্টিকে এড়াতে পারেনি। জমিদারি সেরেস্তার কর্মচারীকে অধ্যাপনার কাজে ডেকে এনে একজনকে দিয়ে লিখিয়েছেন ছেলেমেয়েদের উপযোগী করে বাংলা ভাষায় প্রথম বিজ্ঞান-গ্রন্থমালা, আর-একজনকে দিয়ে বাংলা ভাষার বৃহত্তম অভিধান। বিধুশেখর শাস্ত্রী ইংরেজি ভাষায় অনভিজ্ঞ টোলের পণ্ডিত, সেই মানুষ কালক্রমে বহুভাষাবিদ পণ্ডিতে পরিণত হলেন— ভারতীয় পণ্ডিতসমাজে সর্বাগ্রগণ্যদের অন্যতম। ক্ষিতিমোহন সেনও সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত, তাঁরও জিজ্ঞাসা নতুন পথে প্রবাহিত হলো— মধ্যযুগীয় সাধুসন্তদের বাণী সংগ্রহ করে ভারতীয় জীবন সাধনার বিস্তৃতপ্রায় এক অধ্যায়কে পুনরুজ্জীবিত করলেন। এ সমস্তই সম্ভব হয়েছিল রবীন্দ্রনাথের অনুপ্রেরণায়। তিনি দাবি করেছেন, এঁরা প্রাণপণে সেই দাবি পূরণ করেছেন। দাবি পূরণ করতে গিয়ে এঁদের শক্তি দিনে দিনে বিকাশ লাভ করেছেন। ক্ষিতিমোহনবাবু বলতেন, গুরুদেব নিজ হাতে আমাদের গড়ে নিয়েছেন, নইলে যে বিদ্যা শিখে এসেছিলাম, তাও ঠিকমতো ব্যবহার করা আমাদের সাধ্যে কুলোতো না।

রবীন্দ্রনাথ যে চোখ বুজে এদের গ্রহণ করেছিলেন এমন নয়, চোখ মেলেই করেছিলেন। মানুষ যাচাই করবার বিশেষ একটি রীতি তাঁর ছিল। প্রথমেই দেখে নিতেন দৈনন্দিনের দাবি মিটিয়ে মানুষটির মধ্যে উদ্‌বৃত্ত কিছু আছে কিনা। রবীন্দ্রনাথের সারা জীবনের সাধনা উদ্‌বৃত্তের সাধনা। সংসারের পনেরো-আনা মানুষই আটপৌরে, তাদের দিয়ে নিত্যদিনের গৃহস্থালির কাজটুকু শুধু চলে, বাড়তি কিছু দেবার মতো সম্বল এদের নেই। জমিদারি মহল্লা পরিদর্শন করতে গিয়ে আমিনের সেরেস্তায় নিযুক্ত হরিচরণকে জিজ্ঞেস করেছিলেন— দিনে সেরেস্তার কাজ করো, রাত্রিতে কী করো? হরিচরণ সসংকোচে বলেছিলেন, সন্ধেবেলায় তিনি একটু সংস্কৃতের চর্চা করেন। একখানা বইয়ের পাণ্ডুলিপিও প্রস্তুত আছে। পাণ্ডুলিপিটি চেয়ে নিয়ে দেখে নিলেন। মানুষ কীভাবে অবসর যাপন করে তাই দিয়ে তার প্রকৃত পরিচয়। যার মধ্যে উদ্‌বৃত্ত কিছু নেই তার অবসর কাটে না। ঐ সামান্য বাক্যালাপ থেকেই হরিচরণবাবুর ভবিষ্যৎ সম্ভাবনাটি কবি দেখতে পেয়েছিলেন। এই কারণেই অত্যল্পকালমধ্যে ম্যানেজারের নিকট নির্দেশ এল— তোমার সংস্কৃতজ্ঞ কর্মচারীটিকে শান্তিনিকেতনে পাঠিয়ে দাও। কবি তখন বিদ্যালয়ের প্রয়োজনে 'সংস্কৃতপ্রবেশ' নামে একটি পুস্তক রচনায় নিযুক্ত ছিলেন। সংস্কৃত শিক্ষার সহস্র প্রণালী উদ্ভাবনই ঐ পুস্তকের উদ্দেশ্য ছিল। হরিচরণবাবু আসবার পরে কবি তাঁর অসমাপ্ত পাণ্ডুলিপিটি হরিচরণবাবুর হস্তে অর্পণ করেন। অধ্যাপনা-কার্যের অবসরে তিনি কবির নির্দেশমতো ঐ পুস্তকরচনা সমাপ্ত করেন।

১৩০৯ সালে অর্থাৎ বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার বৎসরকাল মধ্যেই হরিচরণবাবু শান্তিনিকেতনের কাজে যোগ দিয়েছিলেন। কর্মনিষ্ঠার দ্বারা অল্পকাল মধ্যেই নিঃসন্দেহ রবীন্দ্রনাথের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করেছিলেন, নতুবা কাজে যোগ দেবার পর দু বৎসর অতিক্রান্ত হতে-না হতেই ৩৭/৩৮ বৎসরের এক যুবককে ঐ সুবৃহৎ অভিধান রচনার কার্যে আহ্বান করতেন না। অপর পক্ষে শান্তিনিকেতনে বসবাসের শুরু থেকেই বিদ্যাচর্চার যে উৎসাহ এবং উদ্দীপনা তিনি বোধ করেছেন সে-কথা আত্মপরিচয়-প্রসঙ্গে হরিচরণবাবু নিজ মুখেই ব্যক্ত করেছেন। সুতরাং রবীন্দ্রনাথের প্রস্তাব তাঁর কাছে দেবতার আশীর্বাদের মতো মনে হয়েছে।

তিনি তৎক্ষণাৎ নম্রহৃদয়ে নতমস্তকে কবির আদেশ শিরোধার্য করে নিলেন। ১৩১২ সালে অভিধান রচনার সূচনা, রচনাকার্য সমাপ্ত হলো ১৩৩০ সালে। মাঝে আর্থিক অনটনের দরুন শান্তিনিকেতনের কর্ম ত্যাগ করে তাঁকে কিছুকালের জন্য কলকাতায় যেতে হয় এবং অভিধান-সংকলনের কাজ বন্ধ থাকে। এটি তাঁর নিজের পক্ষে যেমন রবীন্দ্রনাথের পক্ষেও তেমনি ক্লেশের কারণ হয়েছিল। তাঁকে অবিলম্বে শান্তিনিকেতনে ফিরিয়ে আনবার জন্যে কবি নিজেই উদ্যোগী হলেন। রবীন্দ্রনাথের আবেদনক্রমে বিদ্যোৎসাহী মহারাজ মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী অভিধান রচনাকার্যে সহায়তার উদ্দেশ্যে হরিচরণবাবুর জন্য মাসিক পঞ্চাশ টাকার একটি বৃত্তি ধার্য করেন। ১৩১৮ সাল থেকে অভিধান-সংকলনকার্য শেষ হওয়া পর্যন্ত তেরো বৎসরকাল তিনি এই বৃত্তি ভোগ করেছেন। বাংলাদেশের গৌরবের কথা যে, ইংরেজি ভাষার প্রথম অভিধান-রচয়িতা ডক্টর জনসন যে সহায়তা থেকে বঞ্চিত হয়েছিলেন, হরিচরণবাবুর বেলায় তা ঘটেনি। মহারাজের মহানুভবতার কথা শেষ পর্যন্ত কৃতজ্ঞচিত্তে স্মরণ করেছেন; আর রবীন্দ্রনাথ যে তাঁর জন্যেই উপযাচক হয়ে মহারাজের কাছে আবেদন জানিয়েছিলেন সে কথাও মুহূর্তের জন্য বিস্মৃত হননি। মুদ্রণকার্য শুরু হবার পূর্বেই মহারাজ মণীন্দ্রচন্দ্রের মৃত্যু হয়। যাঁর সহায়তায় অভিধান রচনা সম্ভব হলো তাঁকে স্বহস্তে একখণ্ড অভিধান কৃতজ্ঞতার অর্ঘ্যস্বরূপ অর্পণ করতে পারেননি, এই দুঃখটি শেষ পর্যন্ত তাঁর মনে ছিল। ১০৫ খণ্ডে সমাপ্ত অভিধান-মুদ্রণ শেষ হবার পূর্বে রবীন্দ্রনাথও বিদায় নিলেন। হরিচরণবাবুর করুণ উক্তি, 'যিনি প্রেরণাদাতা, যাঁর অভীষ্ট এই গ্রন্থ তিনি স্বর্গত, তাঁর হাতে এর শেষ খণ্ড অর্পন করতে পারিনি।' কিন্তু হরিচরণবাবু সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের ভবিষ্যদ্বাণী মিথ্যা হয়নি। বলেছিলেন, 'মহারাজের বৃত্তিলাভ ঈশ্বরের অভিপ্রেত, অভিধানের সমাপ্তির পূর্বে তোমার জীবননাশের শঙ্কা নাই।' কবিবাক্য মিথ্যা হয় না, এ ক্ষেত্রেও হয়নি।

পাণ্ডুলিপির কাজ শেষ হয় ১৩৩০ সনে। তার পরেও প্রায় দশ বৎসর কাল অপেক্ষা করতে হয়েছে— অর্থাভাবে মুদ্রণকার্যে হাত দেওয়া সম্ভব হয়নি। এরূপ বিরাট গ্রন্থ প্রকাশের সামর্থ্য বিশ্বভারতীর ছিল না। অবশ্য মাঝে এই কয়েক বৎসরও তিনি অভিধানের নানা পরিবর্তন-পরিবর্ধনের কাজ নিয়েই তার যৎকিঞ্চিত সম্বল নিয়ে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র খণ্ডে ক্রমশ প্রকাশের আয়োজন করেন। প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব নগেন্দ্রনাথ বসু মহাশয় মুদ্রণব্যাপারে উদ্যোগী হয়েছিলেন। শান্তিনিকেতনের প্রাক্তন ছাত্ররা এবং শান্তিনিকেতনের অনুরাগী কিছুসংখ্যক শিক্ষিত ব্যক্তি নিয়মিত গ্রাহক হয়ে এই ব্যাপারে যথেষ্ট আনুকূল্য করেন।

১৩১২ সালে রচনার সূচনা, ১৩৫২ সালে মুদ্রণকার্য সমাপ্ত। জীবনের চল্লিশটি বছর এক ধ্যান, এক জ্ঞান, এক কাজ নিয়ে কাটিয়েছেন। এ কাজ মহাযোগীর জীবন। বাঙালি চরিত্রে অনেক গুণ আছে, কিন্তু নিষ্ঠার অভাব। এদিক থেকে হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় বাঙালিজাতির সম্মুখে এক অত্যুজ্জল দৃষ্টান্ত রেখে গিয়েছিলেন। নিষ্ঠার যথার্থ পুরস্কার অভীষ্ট কার্যের সফল সমাপ্তি। এর অধিক কোনো প্রত্যাশা তাঁর ছিল না। সুখের বিষয়, লৌকিক পুরস্কারও কিছু তাঁর ভাগ্যে জুটেছে। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে সরোজিনী স্বর্ণপদক দিয়ে সম্মানিত করেছেন। শান্তিনিকেতন আশ্রমিক সংঘ প্রাচীন ভারতীয় রীতিতে যোড়শোপচারে সম্বর্ধনা জ্ঞাপন করেছিলেন। সর্বশেষে বিশ্বভারতী তাঁকে 'দেশিকোত্তম' (ডি. লিট.) উপাধিদানে সম্মানিত করেন।

অভিধান-জাতীয় গ্রন্থের গুণাগুণ বিচারের ক্ষমতা আমার নাই। এ বিষয়ে বিশেষজ্ঞরাই মতামত দেবার অধিকারী। কোনো কোনো বিশেষজ্ঞের মুখে শুনেছি অভিধানে কিছু কিছু ঘাটতি আছে। এরূপ বৃহৎ ব্যাপারে—

বিশেষ করে একক চেষ্টায়— কিছু ত্রুটি-বিচ্যুতি থাকা অসম্ভব নয়। সাহিত্য অকাদেমির উদ্যোগে অভিধানের পুনর্মুদ্রণের পূর্বে বিশেষজ্ঞদের দ্বারা একবার পুনর্মার্জনার ব্যবস্থা করে নিলে বোধ করি ভালোই হতো। অন্যান্য দেশে এরূপ কার্য কোনো বিশ্ববিদ্যালয় বা কোনো বিদ্বৎ পরিষৎ অর্থাৎ পণ্ডিত গোষ্ঠীর দ্বারা সম্পন্ন হয়েছে, একক চেষ্টায় এরূপ বিরাট কাজের দৃষ্টান্ত বিরল। এই অভিধানের প্রধান বৈশিষ্ট্য— বাংলা এবং সংস্কৃত সাহিত্য থেকে প্রত্যেক শব্দের বহুবিধ প্রয়োগের দৃষ্টান্ত আহরণ। এই কার্যে যে শ্রম এবং জ্ঞানের প্রয়োজন হয়েছে তা ভাবলে বিস্মিত হতে হয়। আমরা যারা বিশেষজ্ঞ নই, তাদের কাছে অভিধানের এই অঙ্গটি মহামূল্য, ব্যক্তিগতভাবে আমি এর কাছে অশেষ ঋণে ঋণী।

আমি যখন শান্তিনিকেতনের কাজে যোগ দিই তখনো অভিধানের মুদ্রণকার্য শেষ হয়নি। লাইব্রেরিগৃহের একটি অনতিপ্রশস্ত প্রকোষ্ঠে তাঁকে নিবিষ্ট মনে কাজ করতে দেখেছি।

প্রথম যুগের কর্মীদের সম্পর্কে দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় একটি করে চৌপদী লিখে দিয়েছিলেন। একান্ত মনে কাজে মগ্ন হরিচরণবাবুকে দেখে তাঁর সম্পর্কিত শ্লোকটি আমার মনে পড়ে যেত—

কোথা গো ডুব মেরে রয়েছ তলে
হরিচরণ! কোন গরতে?
বুঝেছি! শব্দ-অবধি-জলে
মুঠাচ্ছ খুব অরথে!

কোথায় কোন গর্তে বসে হরিচরণ শব্দবারিধি থেকে মুঠো মুঠো 'অর্থ' কুড়োচ্ছেন— বর্ণনার সঙ্গে নিবিষ্টচিত্ত আভিধানিকের মূর্তিটি দিব্যি মিলে যেত।

বলা বাহুল্য, তখন তিনি বিশ্বভারতীর কাজ থেকে অবসর গ্রহণ করেছেন, বয়স পঁচাত্তর উত্তীর্ণ। তখনকার দিনে কে কবে অবসর গ্রহণ করতেন জানবার কোনো উপায় ছিল না, কারণ অবসর গ্রহণের পরেও তাঁরা পূর্ববৎ নিজ আসনে নিজ কাজে অভিনিবিষ্ট থাকতেন। কাজের সঙ্গে মাস-মাহিনার কোনো সম্পর্ক ছিল না। উল্লেখ করা প্রয়োজন যে তিনি অভিধান ছাড়াও কয়েকখানা গ্রন্থ রচনা করে গিয়েছেন।

অভিধান-মুদ্রণ শেষ হবার পরেও তাঁকে নিত্য দেখেছি। প্রাতঃভ্রমণ এবং সান্ধ্যভ্রমণ নিত্যকর্ম ছিল। পথে দেখা হলে ক্ষীণদৃষ্টিবশত সব সময় লোকজন চিনতে পারতেন না। কখনো চিনতে পারলে সস্নেহে কুশলবার্তা জিগ্‌গেস করতেন। বিরানব্বুই বৎসর বয়সে (১৯৫৯ সালে) তিনি দেহরক্ষা করেছেন। শেষ পর্যন্ত মস্তিষ্কের শক্তি অটুট ছিল। শেষ বয়সে তাঁকে দেখলে একটি কথা প্রায়ই মনে হতো। ইংরেজ ঐতিহাসিক তথা সাহিত্যিক গিবন তাঁর 'দি ডিক্লাইন অ্যান্ড ফল অফ দি রোমান এম্পায়ার' নামক গ্রন্থের রচনা সমাপ্ত করে বলেছিলেন, হঠাৎ মনে হলো জীবনের সব কাজ ফুরিয়ে গিয়েছে, কিছুই আর করবার নেই। মনে খুব একটা অবসাদের ভাব এসেছিল। গিবন উক্ত গ্রন্থ প্রণয়নে দীর্ঘ বারো বৎসর কাল একান্ত মনে নিযুক্ত ছিলেন, আর হরিচরণবাবু জীবনের চল্লিশ বৎসর কাল অনন্যমনা হয়ে এক কাজে মগ্ন ছিলেন। কর্মাবসানে তাঁর মনের অবস্থা কেমন হয়েছিল জানতে কৌতূহল হতো। গ্রন্থ সমাপ্তির পরেও চোদ্দো বৎসর তিনি জীবিত ছিলেন। যখনই দেখেছি তাঁকে প্রসন্নচিত্ত বলেই মনে হতো। এরূপ সাধক মানুষের মনে কোথাও একটি প্রশান্তি বিরাজ করে। এজন্য সুখে-দুঃখে কখনো তাঁরা বিচলিত হন না।

হাতেকলমে

হীরেন্দ্রনাথ দত্ত (১৯০৩ — ১৯৯৫) : ইন্দ্রজিৎ নামে সমধিক পরিচিত। *ইন্দ্রজিতের খাতা* ও *ইন্দ্রজিতের আসর* তাঁর প্রধান গ্রন্থ। তাঁর লেখা অন্যান্য গ্রন্থগুলির মধ্যে *অচেনা রবীন্দ্রনাথ, আপন মনের মাধুরী মিশায়ে, কালের যাত্রার ধ্বনি, খেলা ভাঙার খেলা, শান্তিনিকেতনে একযুগ, শেষ পারানির কড়ি, সাহিত্যের আড্ডা* ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য।

১.১ হীরেন্দ্রনাথ দত্ত রচিত দুটি বই-এর নাম লেখো।

১.২ কোন নামে তিনি সমধিক পরিচিত?

২. **নীচের প্রশ্নগুলির উত্তর নিজের ভাষায় লেখো :**

২.১ শান্তিনিকেতন বিদ্যালয়ে প্রথম যুগে যাঁরা রবীন্দ্রনাথের আহ্বানে বিদ্যালয়ের কাজে এসে যোগ দিয়েছিলেন, এমন কয়েকজনের কথা আলোচনা করো।

২.২ ‘এর কৃতিত্ব অনেকাংশে শান্তিনিকেতনের প্রাপ্য...’ — কোন কৃতিত্বের কথা বলা হয়েছে? তার বহুলাংশ ‘শান্তিনিকেতনের প্রাপ্য’ বলে লেখক মনে করেছেন কেন?

২.৩ ‘আমাদের শিক্ষাক্ষেত্রে শান্তিনিকেতনের দান অপরিসীম।’ – লেখক এ প্রসঙ্গে শান্তিনিকেতনের কোন কোন গুরুত্বপূর্ণ অবদানের উল্লেখ করেছেন?

২.৪ ‘আপাতদৃষ্টিতে যে মানুষ সাধারণ তাঁরও প্রচ্ছন্ন সম্ভাবনা রবীন্দ্রনাথের সর্বদর্শী দৃষ্টিতে এড়াতে পারেনি।’ — লেখক এ প্রসঙ্গে কাদের কথা স্মরণ করেছেন? জ্ঞান-বিজ্ঞানের চর্চায় তাঁদের অবদান সম্পর্কে আলোচনা করো।

২.৫ ‘এঁরা প্রাণপণে সেই দাবি পূরণ করেছেন।’ — কাদের কথা বলা হয়েছে? কীই বা সেই দাবি? সেই দাবিপূরণে প্রাণপণে তাঁদের নিয়েজিত হওয়ারই বা কারণ কী বলে তোমার মনে হয়?

২.৬ শান্তিনিকেতনের সঙ্গে হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সম্পর্ক কীভাবে গড়ে উঠেছিল? প্রবন্ধ অনুসরণে তাঁর সারাজীবনব্যাপী সারস্বত-সাধনার পরিচয় দাও।

২.৭ রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে হরিচরণ বন্দ্যোপাধায়ের ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যের পরিচয় প্রবন্ধটিকে কীভাবে উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছে আলোচনা করো।

২.৮ ‘একক প্রচেষ্টায় এরূপ বিরাট কাজের দৃষ্টান্ত বিরল।’ — কোন কাজের কথা বলা হয়েছে? একে ‘বিরাট কাজ’ বলার কারণ কী?

২.৯ ‘হরিচরণবাবুকে দেখে তাঁর সম্পর্কিত শ্লোকটি আমার মনে পড়ে যেত’ — শ্লোকটি কার লেখা? শ্লোকটি উদ্ধৃত করো।

২.১০ হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় সংকলিত অভিধানটির নাম কী? গ্রন্থটির রচনা মুদ্রণ ও প্রকাশনার ক্ষেত্রে নানাবিধ ঘটনার প্রসঙ্গ প্রাবন্ধিক কীভাবে স্মরণ করেছেন?

২.১১ প্রাবন্ধিকের সঙ্গে হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের ব্যক্তিগত স্মৃতির প্রসঙ্গ প্রবন্ধে কীরূপ অনন্যতার স্বাদ এনে দিয়েছে তা আলোচনা করো।

২.১২ ‘তিনি অভিধান ছাড়াও কয়েকখানা গ্রন্থ রচনা করে গিয়েছেন।’ — হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় রচিত অন্যান্য কয়েকটি গ্রন্থের নাম ও বিষয়বস্তুর সংক্ষিপ্ত পরিচয় দাও।

২.১৩ হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রতি প্রাবন্ধিক হীরেন্দ্রনাথ দত্ত তাঁর অনুরাগ কীভাবে ব্যক্ত করেছেন, তা বিশদভাবে আলোচনা করো।

শব্দার্থ : হঠকারিতা — বিবেচনা না করে কাজ করা। বিদ্যোৎসাহী — বিদ্যা প্রসারে উৎসাহ দানকারী। অকিঞ্চন — নিঃস্ব/দরিদ্র। অভিনিবেশ — মনোনিবেশ। উপযাচক — বিনা আহ্বানে আসা।

বঙ্গীয় শব্দকোষের বর্তমান প্রচ্ছদ

হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৬৭ — ১৯৫৯) : ঠাকুরবাড়ির জমিদারি এলাকায় সংস্কৃত ভাষার শিক্ষক ছিলেন। পরে পাতিসর অফিসের কর্মাধ্যক্ষ হন। রবীন্দ্রনাথ তাঁকে ১৯০২ সালে শান্তিনিকেতনে নিয়ে আসেন। সংস্কৃত শিক্ষার ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথ যে কাজ শুরু করেছিলেন, হরিচরণ তিন খণ্ডে *সংস্কৃত প্রবেশ* লিখে তা সমাপ্ত করেন। পাঠ্য রচনাটিতে তাঁর অভিধান সংকলনের বিশদ বিবরণ পাওয়া যাবে।

ভালোবাসা কি বৃথা যায়?

শিবনাথ শাস্ত্রী

অকপটে মানুষ যদি মানুষকে ভালোবাসে, তবে তাহা বৃথা যায় না। পৃথিবীর বড়োলোকদের এই প্রকৃতি দেখি, তাঁহারা ভালোবাসাতেও বড়ো। তাঁহারা যেমন মানুষকে অকপটে ভালোবাসিতে পারিয়াছেন, এমন সাধারণ লোকে পারে না। তাঁহারা মানুষকে ভালোবাসিতেন বলিয়া, মানুষও তাঁহাদিগকে ভালোবাসিত, তাঁহাদের জন্য প্রাণ দিতে চাহিত, তাঁহাদের গুণ চিরদিন স্মরণ করিত।

দুইজন ইংরেজ এদেশের লোককে অকপটে ভালোবাসিতেন। একজন ডেভিড হেয়ার, আর একজন ড্রিঙ্ক ওয়াটার বিটন (বেথুন)। ইঁহার নামের প্রকৃত উচ্চারণ বিটন, কিন্তু এদেশে বেথুন হইয়া পড়িয়াছে। সেই নামেই সকলে ইঁহাকে জানে। এই দুই ইংরেজ বাংলাদেশে প্রাতঃস্মরণীয় ব্যক্তি হইয়াছেন। কীসের গুণে? অকপট ভালোবাসার গুণে। হেয়ার সাহেব একজন সামান্য ঘড়িওয়ালা সাহেব ছিলেন; ঘড়ি তৈয়ার ও ঘড়ি মেরামত করিয়া খাইতেন। বেথুন সাহেব পর্যন্ত গভর্নর জেনারেল সাহেবের সভাতে এক বড়ো কাজ করিতেন। হেয়ারের পূর্বেও অনেক ঘড়িওয়ালা সাহেব এদেশে আসিয়াছেন এবং এখনও অনেক ঘড়িওয়ালা সাহেব এদেশে আছেন; কই তাহারা তো প্রাতঃস্মরণীয় লোক হন নাই? সেইরূপ মহাত্মা বেথুনের পরেও তো ওই পদে কত বড়ো ইংরেজ আসিয়াছেন, কই তাহারা তো কেহ নাম রাখিয়া যাইতে পারেন নাই। ইহার কারণ কী? কারণ এই হেয়ার ও বেথুন এদেশের লোককে অকপটে ভালোবাসিতেন।

হেয়ার সাহেবের জীবনের সংক্ষিপ্ত বিবরণ এই। তিনি স্কটল্যান্ড দেশীয় লোক; প্রায় আশি-নব্বই বৎসর হইল ঘড়িওয়ালার কাজ করিবার জন্য এদেশে আগমন করেন। ঘড়ির কাজে কিছু সংগতি করিয়া কলকাতাতে বাস করেন। মহাত্মা রাজা রামমোহন রায়ের সহিত হেয়ারের পরিচয় হয় ও আত্মীয়তা জন্মে। দুই বন্ধুতে সর্বদা এই কথাবার্তা হইত যে, এদেশের বালকদিগের ইংরেজি শিক্ষার উপায় না করিলে চলিতেছে না। ক্রমে তাঁহাদের পরামর্শ কাজে

দাঁড়াইল। ১৮১৭ সালে রামমোহন রায় ও হেয়ারের উদ্যোগে ও তখনকার সুপ্রিমকোর্টের প্রধান বিচারপতি স্যার হাইড ইস্ট সাহেবের সহায়তায়, এদেশের বালকদের ইংরেজি শিক্ষার জন্য হিন্দু স্কুল খোলা হইল। তদবধি হেয়ার আর সকল কাজ ছাড়িয়া এই কাজে লাগিয়া গেলেন। এতদ্ভিন্ন তিনি কলকাতার স্থানে স্থানে অনেকগুলি স্কুল খুলিলেন এবং একটি সভা স্থাপন করিয়া স্কুলপাঠ্য পুস্তকসকল প্রকাশ করাইতে লাগিলেন। সংক্ষেপে বলিতে গেলে, হেয়ার বাংলাদেশে ইংরেজি শিক্ষার পিতা।

কিন্তু আমরা হেয়ারের যে সদগুণ স্মরণ করিয়া মুগ্ধ, সে তাঁহার অকপট ভালোবাসা। বিদেশি হইয়া এদেশের লোককে এমন অকপটে কেহ ভালোবাসেনাই। সেকালের লোকের মুখে শুনিয়াছি হেয়ার প্রতিদিন একখানি পালকিতে করিয়া স্কুল দেখিতে আসিতেন। তাঁহার পালকিতে নানাপ্রকার ঔষধ থাকিত; যেন সঙ্গে একটি ডিসপেনসারি! সঙ্গে ঔষধ লইবার অভিপ্রায় এই, পথে যাইতে যাইতে যে সকল পাড়া আছে, তাহাদের বাড়ি হইয়া যাইতেন এবং যাহাদের ঔষধ কিনিবার সামর্থ্য নাই, তাঁহাদিগকে ঔষধ দিয়া যাইতেন। তাহার সেই প্রসন্ন ও প্রেমপূর্ণ মুখ প্রতিদিন দেখিয়া দেখিয়া, অনেক বাড়ির বৃদ্ধা গৃহিণীদের তাঁহার প্রতি এমন ভাব জন্মিয়াছিল যে, হেয়ার আসিলে তাঁহাদের বোধ হইত, কে যেন আপনার লোক আসিয়াছে।

হেয়ার হিন্দু স্কুলের ছোটো ছোটো ছেলেদের এত ভালোবাসিতেন যে, একটার সময় টিফিনের ছুটি হইলে হেয়ারের আর অন্য কাজ থাকিত না; তিনি দৌড়াইয়া আসিয়া একদৃষ্টে দাঁড়াইয়া ছেলেদের খেলা দেখিতেন। একদিন হেয়ার দেখিলেন, একটি বালক অপর একটি বালকের কাঠের বলটি কাড়িয়া লইয়া গোলদিঘির জলে ফেলিয়া দিল। তাহাতে ওই বালকটি চিৎকার করিয়া কাঁদিতে লাগিল। হেয়ার কি আর স্থির থাকিতে পারেন? তিনি দৌড়াইয়া বিবাদস্থলে উপস্থিত হইলেন। দুষ্টু বালকটিকে তিরস্কার করিয়া যে কাঁদিতেছিল, তাহাকে কোলে তুলিয়া বুকে ধরিয়া অনেক বুঝাইতে লাগিলেন। বলিলেন— তুমি কাঁদিও না, তোমাকে কালই ভালো বল দিব। তার পরদিন অতি প্রত্যুষে হেয়ার পদব্রজে লালদিঘির ধার হইতে সুকিয়া স্ট্রিটে, স্কুলের কার্যাধ্যক্ষ পরলোকগত হরমোহন চট্টোপাধ্যায়ের বাড়িতে আসিয়া উপস্থিত। বলিলেন, 'হরমোহন, আজ স্কুলে যাইবার সময় গোটাকতক কাঠের বল লইয়া যাইও।' যথাসময়ে হেয়ার স্কুলে আসিলেন; সেই বালকটির ক্লাসে গিয়া তাহাকে কোলে করিয়া একটি সুন্দর বল তাহার হাতে দিলেন। জিজ্ঞাসা করিলেন, 'কেমন, খুশি হয়েছ তো?' সে মুখ ভার করিয়া বলিল— 'আমার সে বল এর চেয়েও ভালো ছিল।' হেয়ার আর এক হাতে আর একটি বল দিলেন;— 'এবার?' সে তাহাতেও সন্তুষ্ট নয়। অবশেষে তাহার দুইটি বল ও দুই বগলে দুই বল দিয়া আসিয়া বলিলেন,—'এবার?' তখন সে সন্তুষ্ট হইল, হেয়ারও নিস্তার পাইলেন।

আর একবার চন্দ্রশেখর দেব নামক একটি বালক লালদিঘির ধারে হেয়ারের বাড়িতে তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে গিয়াছিল। বসিয়া কথা কহিতে কহিতে সন্ধ্যা হইয়া গেল। হেয়ারের আহারের সময় উপস্থিত, ওদিকে মুষলধারে বৃষ্টি নামিল। বৃষ্টি থামিতে রাত্রি কিছু অধিক হইয়া গেল। বৃষ্টি থামিয়া গেলেই চন্দ্রশেখর গৃহে ফিরিতে প্রস্তুত, কিন্তু হেয়ার তাহাকে সেই রাত্রে একাকী ছাড়িয়া দেন কীরূপে? একে অন্ধকার রাত্রি, তাহাতে আবার লালবাজারের মাতাল গোরাদের ভিতর দিয়া যাইতে হইবে। হেয়ার বলিল, 'চন্দর, বোসো আমি তোমাকে আগাইয়া দিব।' চন্দ্র বলিল, 'আপনার যাইবার প্রয়োজন নাই, আমি একাই যাইতে পারিব।' হেয়ার কোনোমতেই তাহা শুনিলেন না; একটি প্রকাণ্ড লাঠি লইয়া চন্দ্রশেখরের সহিত কথা কহিতে কহিতে বাহির হইলেন। বউবাজারের চৌরাস্তার নিকটে আসিয়া চন্দ্রশেখর আবার সাহেবকে ফিরিবার জন্য অনুরোধ করিল।

হেয়ার বলিলেন—'চলো, পটোলডাঙার মোড় পর্যন্ত তোমাকে দিয়ে আসি।' পটোলডাঙার মোড়ের নিকট আসিয়া হেয়ার দাঁড়াইলেন। বলিলেন, 'তুমি বাসাতে যাও।' চন্দ্রশেখর পটোলডাঙার নিকটেই থাকিত, বাসাতে গিয়া দ্বার বন্ধ করিল। কিয়ৎক্ষণ পরেই কে আসিয়া দ্বারে আঘাত করিতেছে, 'চন্দর, চন্দর।' বাসার লোকে দ্বার খুলিয়াই দেখে হেয়ার সাহেব। সাহেব জিজ্ঞাসা করিলেন, 'চন্দর কি ঘরে পৌঁছাইয়াছে?' উত্তর—হ্যাঁ, তখন হেয়ার সন্তুষ্টচিত্তে ঘরে ফিরিলেন।

এ কী ভালোবাসা। ছেলেটির সঙ্গে প্রায় এক ক্রোশ আসিয়াও সাহেবের ভাবনা গেল না; ভাবিলেন, একবার দেখি, ছেলেটা বাসাতে পৌঁছাইল কিনা। মায়েই মানুষকে এত ভালোবাসিয়া থাকে, অন্যে কি এত ভালোবাসিতে পারে? একবার একটি প্রকাশ্য সভামধ্যে দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায় নামক একজন শিক্ষিত যুবক বক্তৃতা করিবার সময় হেয়ারকে সম্বোধন করিয়া বলিয়াছিলেন,— 'আপনি আমাদের জ্ঞানদাতা পিতা,' বলিয়াই সংশোধনপূর্বক পুনরায় বলিলেন— 'না না, আপনি আমাদের মাতা।' ঠিক কথা! ঠিক কথা! হেয়ার বাঙালির ছেলেকে মায়ের মতো ভালোবাসিতেন।

সে ভালোবাসা কি বৃথা গিয়াছে? দ্যাখো, হেয়ারের ভালোবাসা মূর্তি ধরিয়া ইংরেজি শিক্ষারূপে রহিয়াছে। যেদিন হেয়ারের মৃতদেহ কবরে দেওয়া হয়, শুনিতে পাই, সেদিন ভয়ানক দুর্যোগ হইয়াছিল। তথাপি শহরের ছোটোবড়ো ভদ্রলোক আসিতে আর বাকি ছিল না। সেদিন যাঁহারা উপস্থিত ছিলেন, তাহাদের মুখে শুনিয়াছি, যে হেয়ারের মৃতদেহের সঙ্গে সঙ্গে অন্তত দশ হাজার স্কুলের বালক ও বাঙালি ভদ্রলোক আসিয়াছিলেন। হেয়ার আর এ লোকে নাই, এ সংবাদ যখন শহরে ছড়াইয়া পড়িল, তখন অনেক বাঙালি ভদ্রলোকের গৃহে স্ত্রীলোকেরা কাঁদিয়া আকুল হইলেন। অনেক বালক অনেক দিন যেন মৃতাশৌচ ধারণ করিল। কলকাতার প্রেসিডেন্সি কলেজের উঠানে হেয়ারের যে প্রতিমূর্তি আছে, তাহা করিতে যে ব্যয় হইয়াছে, তাহার অধিকাংশ এদেশের লোকে দিয়াছে। তাই বলি, ভালোবাসা কি কখনও বৃথা যায়।

আর এক মহাত্মা বেথুন সাহেব। হেয়ার বাঙালির ছেলেদের জন্য যাহা করিয়াছিলেন, বেথুন বাঙালির মেয়েদের জন্য তাহা করিয়াছেন। ইনি গভর্নর জেনারেলের আইনমন্ত্রী হইয়া বড়ো পদ লইয়া এদেশে আসিয়াছিলেন। এদেশের রমণীদের দুরবস্থা দেখিয়া তাঁহার প্রাণে বড়ো কষ্ট হইয়াছিল। যাহাতে এদেশে স্ত্রীশিক্ষা প্রচলিত হয়, সেজন্য তিনি প্রাণপণ করিলেন। সেজন্য কলকাতাতে একটি বালিকা বিদ্যালয় খুলিলেন।

নিজে সর্বদা তাহার তত্ত্বাবধান করিতে আসিতেন। বালিকাদিগকে লইয়া খেলা করিতে ভালোবাসিতেন। শুনিয়াছি, এমনি তাঁর ভালোবাসা ছিল, যে চারিপায়ে ঘোড়া হইয়া বাঙালির মেয়েকে পিঠের ওপর চড়াইয়া চলিতেন, ও জিজ্ঞাসা করিতেন, 'কেমন মেম? কেমন ঘোড়া?' তিনি স্কুলের মেয়েদিগকে নিজের গাড়িতে করিয়া বড়ো বড়ো সাহেবদের বাড়িতে লইয়া যাইতেন; তাহাদিগকে প্রায় কাপড়-অলংকার প্রভৃতি দিতেন; কেহ একটু পড়িতে পারিতেছে দেখিলে যেন আকাশের চাঁদ হাতে পাইতেন। এ সকল কথা শুনিলে চক্ষের জল রাখা যায় না। সাধে কি বিদ্যাসাগর বেথুনের নাম করিলে কাঁদিয়া ফেলিতেন? বেথুন মৃত্যুকালে তাঁহার প্রতিষ্ঠিত স্কুলের জন্য অনেক হাজার টাকা রাখিয়া গিয়াছেন। তাঁহারই পুণ্যে তাঁহারই প্রতিষ্ঠিত বালিকা বিদ্যালয় এখন কলেজ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। তাহা হইতে এখন ছাত্রীরা বিএ, এমএ পাশ করিয়া বাহির হইতেছে। বেথুনের ভালোবাসা কি বৃথা গিয়াছে? যে ভালোবাসা স্মরণ করিয়া বিদ্যাসাগর মহাশয়ের মতো লোকের চক্ষে জল পড়িয়াছে, সে ভালোবাসা কি বৃথা গিয়াছে? ইউরোপের অনেক দেশে সে দেশের বড়োলোকদিগের ছোটো ছোটো প্রতিমূর্তি কিনিতে পাওয়া যায়। লোকে কিনিয়া ঘরে রাখে, বালক-বালিকারা সেদিন হইতে তাঁহাদিগকে শ্রদ্ধা করিতে শেখে। আমাদের বোধহয় হেয়ার, রামমোহন ও বেথুনের প্রতিমূর্তিও ঘরে ঘরে থাকা উচিত।

ঘুরে দাঁড়াও

প্রণবেন্দু দাশগুপ্ত

সরতে সরতে সরতে
তুমি আর কোথায় সরবে?
এবার ঘুরে দাঁড়াও।

ছোট্ট একটা তুক করে বাইরেটা পালটে দাও—

সাইকেল-রিকশোগুলো শিস দিয়ে চলে যাক বনে-বনান্তরে,
কাদা-ভর্তি রাস্তা উঠে পড়ুক ছায়াপথের কাছাকাছি,
গাছগুলো নদীর জলে স্নান করে আসুক,
সা-রা-রা-রা করে জেগে উঠুক উপান্তের শহরতলি।

তুমি যদি বদলে দিতে না পারো
তাহলে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে মরতে হবে।
এখন হাত বাড়াও, ধরো
যেখানে আছ, সেখান থেকেই সবকিছুকে টেনে আনো,
নইলে সরতে সরতে সরতে
তুমি বিন্দুর মতো মিলিয়ে যাবে।
এখন ঘুরে দাঁড়াও॥

হাতে কলমে

প্রণবেন্দু দাশগুপ্ত (১৯৩৩ —২০০৭): বিশিষ্ট কবি। যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে তুলনামূলক সাহিত্য বিভাগের অধ্যাপক ছিলেন। তাঁর লেখা কাব্যগ্রন্থগুলির মধ্যে *এক ঋতু, সদর স্ট্রীটের বারান্দা, নিজস্ব ঘুড়ির প্রতি, হাওয়া স্পর্শ করো* প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। তিনি *অলিন্দ* নামে একটি কবিতাপত্রিকার সম্পাদক ছিলেন।

১.১ প্রণবেন্দু দাশগুপ্ত সম্পাদিত কবিতা পত্রিকাটির নাম কী?

১.২ তাঁর রচিত দুটি কাব্যগ্রন্থের নাম লেখো।

২. নীচের প্রশ্নগুলির উত্তর নিজের ভাষায় লেখো :

২.১ কবিতায় কবি কোন আহ্বান জানিয়েছেন?

২.২ 'ছোট্ট একটা তুক করে বাইরেটা পালটে দাও -'— 'বাইরে'টায় কী ধরনের বদল ঘটবে বলে কবি আশা করেন? সেই কাঙ্ক্ষিত বদল ঘটলে জীবন কীভাবে অন্যরকম হবে বলে কবি মনে করেন?

২.৩ 'সরতে সরতে সরতে

তুমি আর কোথায় সরবে?' — কবি কোথা থেকে এই 'সরণ' লক্ষ করেছেন? এক্ষেত্রে তাঁর দেওয়া পরামর্শটি কী?

২.৪ 'এবার ঘুরে দাঁড়াও।' আর 'এখন ঘুরে দাঁড়াও।' — পঙ্‌ক্তি দুটিতে 'এবার' আর 'এখন' শব্দদুটির প্রয়োগ সার্থকতা বুঝিয়ে দাও।

৩. নির্দেশ অনুসারে বাক্য পরিবর্তন করো :

৩.১ তুমি আর কোথায় সরবে? (প্রশ্ন পরিহার করো)

৩.২ এবার ঘুরে দাঁড়াও। (না-সূচক বাক্যে)

৩.৩ তুমি যদি বদলে দিতে না পারো

তাহলে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে মরতে হবে। (সরল বাক্যে)

৩.৪ নইলে সরতে সরতে সরতে

তুমি বিন্দুর মতো মিলিয়ে যাবে। (প্রশ্নবোধক বাক্যে)

৩.৫ গাছগুলো নদীর জলে স্নান করে আসুক। (নির্দেশক বাক্যে)

৪. ব্যাসবাক্যসহ সমাসের নাম লেখো :

বনান্তর, ছায়াপথ, উপান্ত, সাইকেল-রিকশো

সুভা

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

মেয়েটির নাম যখন সুভাষিণী রাখা হইয়াছিল তখন কে জানিত সে বোবা হইবে। তাহার দুটি বড়ো বোনকে সুকেশিনী ও সুহাসিনী নাম দেওয়া হইয়াছিল, তাই মিলের অনুরোধে তাহার বাপ ছোটো মেয়েটির নাম সুভাষিণী রাখে। এখন সকলে তাহাকে সংক্ষেপে সুভা বলে।

দস্তুরমতো অনুসন্ধান ও অর্থব্যয়ে বড়ো দুটি মেয়ের বিবাহ হইয়া গেছে, এখন ছোটোটি পিতামাতার নীরব হৃদয়ভারের মতো বিরাজ করিতেছে।

যে কথা কয় না সে যে অনুভব করে, ইহা সকলের মনে হয় না, এইজন্য তাহার সাক্ষাতেই সকলে তাহার ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে দুশ্চিন্তা প্রকাশ করিত। সে যে বিধাতার অভিশাপ স্বরূপে তাহার পিতৃগৃহে আসিয়া জন্মগ্রহণ হইতে সে আপনাকে গোপন করিয়া রাখিতে সবর্দাই চেষ্টা করিত। মনে করিত, আমাকে সবাই ভুলিলে বাঁচি। কিন্তু বেদনা কি কেহ কখনো ভোলে। পিতামাতার মনে সে সবর্দাই জাগরূক ছিল।

বিশেষত, তাহার মা তাহাকে নিজের একটা ত্রুটিস্বরূপ দেখিতেন। কেননা, মাতা পুত্র অপেক্ষা কন্যাকে

নিজের অংশরূপে দেখেন—কন্যার কোনো অসম্পূর্ণতা দেখিলে সেটা যেন বিশেষরূপে নিজের লজ্জার কারণ বলিয়া মনে করেন। বরঞ্চ, কন্যার পিতা বাণীকণ্ঠ সুভাকে তাঁহার অন্য মেয়েদের অপেক্ষা যেন একটু বেশি ভালোবাসিতেন, কিন্তু মাতা তাহাকে নিজের গর্ভের কলঙ্ক জ্ঞান করিয়া তাহার প্রতি বড়ো বিরক্ত ছিলেন।

সুভার কথা ছিল না, কিন্তু তাহার সুদীর্ঘপল্লববিশিষ্ট বড়ো বড়ো দুটি কালো চোখ ছিল—এবং তাহার ওষ্ঠাধর ভাবের আভাসমাত্রে কচি কিশলয়ের মতো কাঁপিয়া উঠিত।

কথায় আমরা যে-ভাব প্রকাশ করি, সেটা আমাদিগকে অনেকটা নিজের চেষ্টায় গড়িয়া লইতে হয়, কতকটা তর্জমা করার মতো ; সকল সময়ে ঠিক হয় না, ক্ষমতা-অভাবে অনেক সময়ে ভুলও হয়। কিন্তু কালো চোখকে কিছু তর্জমা করিতে হয় না—মন আপনি তাহার উপরে ছায়া ফেলে, ভাব আপনি তাহার উপরে কখনো প্রসারিত হয়, কখনো মুদ্রিত হয়; কখনো উজ্জ্বলভাবে জ্বলিয়া উঠে, কখনো ম্লানভাবে নিবিয়া আসে, কখনো অস্তমান চন্দ্রের মতো অনিমিষভাবে চাহিয়া থাকে, কখনো দ্রুত চঞ্চল বিদ্যুতের মতো দিগ্‌বিদিকে ঠিকরিয়া উঠে। মুখের ভাব বৈ আজন্মকাল যাহার অন্য ভাষা নাই, তাহার চোখের ভাষা অসীম উদার এবং অতলস্পর্শ গভীর—অনেকটা স্বচ্ছ আকাশের মতো, উদয়াস্ত এবং ছায়ালোকের নিস্তব্ধ রঙ্গভূমি। এই বাক্যহীন মনুষ্যের মধ্যে বৃহৎ প্রকৃতির মতো একটা বিজন মহত্ত্ব আছে। এইজন্য সাধারণ বালকবালিকারা তাহাকে একপ্রকার ভয় করিত, তাহার সহিত খেলা করিত না। সে নির্জন দ্বিপ্রহরের মতো শব্দহীন এবং সঙ্গীহীন।

২

গ্রামের নাম চণ্ডীপুর। নদীটি বাংলাদেশের একটি ছোটো নদী, গৃহস্থঘরের মেয়েটির মতো; বহুদূর পর্যন্ত তাহার প্রসার নহে; নিরলসা তন্বী নদীটি আপন কূল রক্ষা করিয়া কাজ করিয়া যায়; দুই ধারের গ্রামের সকলেরই সঙ্গে তাহার যেন একটা-না-একটা সম্পর্ক আছে। দুই ধারে লোকালয় এবং তরুচ্ছায়াঘন উচ্চতট ; নিম্নতল দিয়া গ্রামলক্ষ্মী স্রোতস্বিনী আত্মবিস্মৃত দ্রুতপদক্ষেপে প্রফুল্লহৃদয়ে আপনার অসংখ্য কল্যাণকার্যে চলিয়াছে।

বাণীকণ্ঠের ঘর একেবারে নদীর উপরেই। তাহার বাখারির বেড়া, আটচালা, গোয়ালঘর, ঢেঁকিশালা, খড়ের স্তূপ, তেঁতুলতলা, আম কাঁঠাল এবং কলার বাগান নৌকাবাহীমাত্রেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করে। এই গার্হস্থ্য সচ্ছলতার মধ্যে বোবা মেয়েটি কাহারও নজরে পড়ে কি না জানি না, কিন্তু কাজকর্মে যখনি অবসর পায় তখনি সে এই নদীতীরে আসিয়া বসে।

প্রকৃতি যেন তাহার ভাষার অভাব পূরণ করিয়া দেয়। যেন তাহার হইয়া কথা কয়। নদীর কলধ্বনি, লোকের কোলাহল, মাঝির গান, পাখির ডাক, তরুর মর্মর, সমস্ত মিশিয়া চারি দিকের চলাফেরা-আন্দোলন-কম্পনের সহিত এক হইয়া, সমুদ্রের তরঙ্গরাশির ন্যায়, বালিকার চিরনিস্তব্ধ হৃদয়-উপকূলের নিকটে আসিয়া ভাঙিয়া ভাঙিয়া পড়ে। প্রকৃতির এই বিবিধ শব্দ এবং বিচিত্র গতি, ইহাও বোবার ভাষা—বড়ো বড়ো চক্ষুপল্লববিশিষ্ট সুভার যে ভাষা তাহারই একটা বিশ্বব্যাপী বিস্তার ; ঝিল্লিরবপূর্ণ তৃণভূমি হইতে শব্দাতীত নক্ষত্রলোক পর্যন্ত কেবল ইঙ্গিত, ভঙ্গি, সংগীত, ক্রন্দন এবং দীর্ঘনিশ্বাস।

এবং মধ্যাহ্নে যখন মাঝিরা, জেলেরা খাইতে যাইত, গৃহস্থেরা ঘুমাইত, পাখিরা ডাকিত না, খেয়া নৌকা তখন রুদ্র মহাকাশের তলে কেবল একটি বোবা প্রকৃতি এবং একটি বোবা মেয়ে মুখামুখি চুপ করিয়া বসিয়া থাকিত— একজন সুবিস্তীর্ণ রৌদ্রে, আর-একজন ক্ষুদ্র তরুচ্ছায়ায়।

সুভার যে গুটিকতক অন্তরঙ্গ বন্ধুর দল ছিল না, তাহা নহে। গোয়ালের দুটি গাভী, তাহাদের নাম সর্বশী ও পাঙ্গুলি। সে নাম বালিকার মুখে তাহারা কখনো শুনে নাই, কিন্তু তাহার পদশব্দ তাহারা চিনিত—তাহার কথাহীন একটা করুণ সুর ছিল, তাহার মর্ম তাহারা ভাষার অপেক্ষা সহজে বুঝিত। সুভা কখন তাহাদের আদর করিতেছে, কখন ভর্ৎসনা করিতেছে, কখন মিনতি করিতেছে, তাহা তাহারা মানুষের অপেক্ষা ভালো বুঝিতে পারিত।

সুভা গোয়ালে ঢুকিয়া দুই বাহুর দ্বারা সর্বশীর গ্রীবা বেষ্টন করিয়া তাহার কানের কাছে আপনার গণ্ডদেশ ঘর্ষণ করিত এবং পাঙ্গুলি স্নিগ্ধদৃষ্টিতে তাহার প্রতি নিরীক্ষণ করিয়া তাহার গা চাটিত। বালিকা দিনের মধ্যে নিয়মিত তিনবার করিয়া গোয়ালঘরে যাইত, তাহা ছাড়া অনিয়মিত আগমনও ছিল ; গৃহে যেদিন কোনও কঠিন

কথা শুনিত তখন সেদিন সে অসময়ে তাহার এই মূক বন্ধু দুটির কাছে আসিত। — তাহার সহিষ্ণুতা - পরিপূর্ণ বিষাদ শান্ত দৃষ্টিপাত হইতে তাহারা কি একটা অন্ধ অনুমান শক্তি দ্বারা বালিকার মর্মবেদনা যেন বুঝিতে পারিত, এবং সুভার গা ঘেঁসিয়া আসিয়া অল্পে অল্পে তাহার বাহুতে সিং ঘসিয়া ঘসিয়া তাহাকে নির্বাক ব্যাকুলতার সহিত সান্ত্বনা দিতে চেষ্টা করিত।

ইহারা ছাড়া ছাগল এবং বিড়ালশাবক ও ছিল, কিন্তু তাহাদের সহিত সুভার এরূপ সমকক্ষভাবের মৈত্রী ছিল না, তথাপি তাহারা যথেষ্ট আনুগত্য প্রকাশ করিত। বিড়ালশিশুটি দিনে এবং রাত্রে যখন-তখন সুভার গরম কোলটি নিঃসংকোচে অধিকার করিয়া সুখনিদ্রার আয়োজন করিত এবং সুভা তাহার গ্রীবা ও পৃষ্ঠে কোমল অঙ্গুলি বুলাইয়া দিলে যে তাহার নিদ্রাকর্ষণের বিশেষ সহায়তা হয়, ইঙ্গিতে এরূপ অভিপ্রায়ও প্রকাশ করিত।

৩

উন্নত শ্রেণির জীবের মধ্যে সুভার আরো একটি সঙ্গী জুটিয়াছিল কিন্তু তাহার সহিত বালিকার ঠিক কীরূপ সম্পর্ক ছিল তাহা নির্ণয় করা কঠিন, কারণ, সে ভাষাবিশিষ্ট জীব ; সুতরাং উভয়ের মধ্যে সমভাষা ছিল না।

গোঁসাইদের ছোটো ছেলেটি—তাহার নাম প্রতাপ। লোকটি নিতান্ত অকর্মণ্য। সে যে কাজকর্ম করিয়া সংসারের উন্নতি করিতে যত্ন করিবে, বহু চেষ্টার পর বাপ-মা সে আশা ত্যাগ করিয়াছেন। অকর্মণ্য লোকের একটা সুবিধা এই যে, আত্মীয় লোকেরা তাহাদের উপর বিরক্ত হয় বটে, কিন্তু প্রায় তাহারা নিঃসম্পর্ক লোকদের